প্রাচ্যের জাগরণ

শ্রীঅরুণ চন্দ্র দত্ত

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস
৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা

এক টাকা

প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভাদ্র—১৩৩৯

মুদ্রাকর—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রকাশ প্রেস
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৮

এসিয়া জাগিতেছে। তুর্কস্থান হইতে জাপান জাগরণের হিন্দোলে প্লাবিত। আফ্রিকায় মিশরের কণ্ঠে হাহাকার—প্রবল স্বার্থের সংঘাতেই বুঝি তাহার মাথা তুলিবার উপায় নাই। ভারত আজ অনুগ্রহপ্রার্থী হইলেও, এই জাগরণের উৎসবে তাহারও প্রাণ মাতিয়া উঠিয়াছে। প্রভুশক্তি যদি বন্ধন-রজ্জু একটু আল্‌গা করিয়া দেন, তবে সেও এই মহোৎসবে যোগদান করিয়া বাঁচে—ভারতের সে আশাও কি সহজে সফল হইবার নয়!

তুর্কজাতির ভাগ্যবিধাতা গাজী মুস্তফা কামাল পাশা মুক্তির অন্তরায় পদাঘাতে দূর করিয়াছেন, ইসলাম-সভ্যতার যত প্রাচীন রীতি নীতি বর্জ্জন করিয়াছেন, জাতীয় সঙ্গীত পর্য্যন্ত ইউরোপের ছন্দে ঢালিয়া নূতন স্বর যোজনা করিতেছেন, জাতীয় ভাষার আরবী ফার্সী অক্ষর পর্য্যন্ত তাঁহার চক্ষে হিজিবিজি বলিয়া বোধ হইয়াছে—তুর্কের পাঠ্যপুস্তকাদি তাই রোমান অক্ষরে অতঃপর লিখিত হইবার তিনি ব্যবস্থা করিয়াছেন। আফগানিস্থানের রাজা আমানুল্লা স্বদেশবাসীকে এই নবজীবনেরই আস্বাদ দিতে উন্মাদ হইয়াছিলেন—আফগান সর্দ্দার, সৈন্যবাহিনী, পুরনারীগণকে পর্য্যন্ত জাতীয় পরিচ্ছদ বর্জ্জন পূর্ব্বক ইউরোপীয় বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দিতে উৎসাহিত

করিয়াছিলেন। জাপানের তো কথাই নাই—মানচিত্রের বামে ও দক্ষিণে যেন প্রকৃতির একই সৃষ্টি-নৈপুণ্য প্রকাশ পায়; ইংলণ্ডের ন্যায় জাপানও আকারে প্রকারে, শিক্ষায় সভ্যতায় প্রায় তুল্য রূপেই আপনাকে গড়িয়া তুলিয়াছে। চীনের জাগরণ তার প্রাচীন শিক্ষা সভ্যতাকে বর্জ্জন করিয়াই সম্ভব হইয়াছে। তাই অনেকের মতে, ভারতের মুক্তি-পথেও এই প্রাচ্য-ভাবই নাকি বাধার কারণ হইয়াছে। "ভারত-বন্ধু ষ্টেট্‌সম্যান" পর্য্যন্ত সেদিন বলিয়াছিলেন—মহাত্মা গান্ধীর মত দুই একজনের ভারতীয় রীতিনীতির প্রতি গভীর আসক্তি অধিক দিন টিকিবে না; ভারতকে বাঁচিতে হইলে, পাশ্চাত্যের যে প্রত্যক্ষ জীবন-দানের ব্যবস্থা সেইখানেই আজ মাথা নীচু করিয়া দীক্ষা লইতে হইবে। কথাটা কাণে প্রবেশ করিলেই ভারতের ধর্ম্মগৌরবে যেন হাতুড়ীর ঘা পড়ে। আমরা যে পাশ্চাত্যের গুরুর আসন অধিকার করার স্বপ্নে বিভোর হইয়া এত দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যেও বড় আশায় বাঁচিয়াছিলাম। অধিকার যখন যায়, তখন কোনও অধিকারই রাখা সম্ভব হয় না—ইহা সত্য; তবে জাতীয়তার মোহে এমন মিথ্যাকে দীর্ঘ দিন ধরিয়া থাকায় সত্যেরই অপমান করা হইয়াছে। ভারতের আত্মা মুক্তি-কামনায় একটা কাল্পনিক সত্যের পূজা করিয়া জাগ্রত দেবতার সম্মান রাখে নাই। তাই এই কঠোর প্রায়শ্চিত্ত! আজ মুক্তির দিন যেন দুয়ারে আসিয়া উঁকি মারে, ভারতের প্রাচীন পর্ণকুটীরের আর মায়া কেন? যুগদেবতার ডাকে আজিও যদি ভারত বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে না পারে, তিলে তিলে তাহাকে মরিতেই হইবে।

রাজপুত বীরের মত হঠকারিতা করিয়া নিশ্চিহ্ন হওয়া অপেক্ষা স্থিরবুদ্ধি হইয়া বাঁচিবার পথে পা বাড়ান ভাল।

দেশের মুক্তি-পথ-নির্ণয়ে ভারতের ব্রাহ্মণ আজ স্তব্ধ—কণ্ঠ তার স্থির. ক্ষাত্রশক্তি পঙ্গু. চাতুর্ব্বর্ণ্যের শক্তিব্যূহ নিস্তেজ, অকর্ম্মণ্য। যাঁহারা দেশের শ্রেয়ঃ-বিধানে অগ্রসর, তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন, ক্ষত্রিয় নহেন, ভারতের চাতুর্ব্বর্ণ্যের কোনও গুণেরই ইঁহারা চিহ্ন ধারণ করেন না. তবে তাঁহারা ভারতবাসী. পাশ্চাত্য শিক্ষা সাধনায় সিদ্ধ—ইঁহাদের সঙ্কেতেই জাতির গতি নির্দ্ধারিত হয়। প্রাচীন ভারত ভাঙ্গা গলায় যতই প্রতিবাদ করুক, শনৈঃ শনৈঃ ভারতের ভবিষ্যৎ নূতন ভাবেই গড়িয়া উঠিতেছে। এই নিয়ন্তৃ-শক্তিমণ্ডলে ভাটপাড়া নাই, বিক্রমপুর নাই, কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা, নবদ্বীপ নাই—ইংরাজ-গুরু শিষ্য-মণ্ডলীর যোগ্যতা দেখিয়া ইঁহাদের হস্তে ধীরে ধীরে শক্তি দান করিতে থাকিলে, নূতন ভারতকে উঁহারাই গড়িয়া তুলিবেন। রাষ্ট্রনীতির সহিত সমাজ গড়া আজই আরম্ভ হইয়াছে। কামালের ন্যায় আইন করিয়া হিন্দুধর্ম্ম উল্টাইয়া দেওয়া এই অবস্থায় দুঃসাধ্য নহে। ঘটনা অভাবনীয় অসম্ভব মনে হইতে পারে ; রাষ্ট্র হস্তে থাকিলে অসাধ্য যে কিছু নহে, ইহা যদি আজও আমরা অনুমান করিয়া লইতে না পারি, তবে পৃথিবীর খবর রাখি না বলিতে হইবে। কে ভাবিয়াছিল—ইস্‌লাম-তীর্থ স্তাম্বুল হইতে ধর্ম্মগুরুকে আসনচ্যুত করা হইবে! কে ভাবিয়াছিল—আফগানের অন্তঃপুর এক নিমিষে পর্দ্দা ঠেলিয়া প্রকাশ্য জগতে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে ? অসংখ্য

স্বার্থবিচ্ছিন্ন লোকমত ঘটনা-বিশেষে একত্র দাঁড়াইয়া হতেই বাধা প্রকাশ করুক, সংহতিবদ্ধ রাষ্ট্রশক্তির একটি আঘাত আত্মমত প্রবর্ত্তনের পক্ষে যথেষ্ট। বশিষ্ঠের ব্রহ্মবীর্য্য, যোগশক্তি প্রভৃতির কথা হিন্দুর শাস্ত্রে পুরাণেই শোভা পায়, আর যেখানে পৃথিবীর আলো গিয়া পৌঁছায় নাই, সেইখানেই ব্রাহ্মণের ক্রোধ উপবীত ছিন্ন করিয়া অপরাধীর নির্ব্বংশ হওয়ার আতঙ্ক সৃষ্টি করে; কিন্তু প্রবল রাষ্ট্রশক্তির নিকট বিষ্ণুর সুদর্শন-চক্রও বুঝি প্রতিহত হয়! অসাধ্য বলিবা এখানে কোন কথা নাই, জগতের সাধা আজ রাষ্ট্রশক্তি আয়ত্ত করা—এই শক্তির সহিত যে দেশ ও জাতি সম্যক্ পরিচয় সাধন করিয়াছে, সেই দেশ ও জাতি আজ পৃথিবী-জয়ে উদ্যত। কথা উঠে, ভারতের উপর যে রাষ্ট্রশাসনচক্র সংস্থাপিত, তাহার সহিত ইহার পরিচয় ঘটিলেই তো সকল গোল মিটিয়া যায়! এই হেতু সর্ব্ব ধর্ম্ম, সর্ব্ব জাতীয়তা, সকল আদর্শ বিসর্জ্জন দিয়াও আজ আমরা ইহা আপনার করিয়া লইতে চাহি। এই শাসন-চক্রের মূলে যে উদ্দেশ্য, যে আদর্শ, যে নীতি তাহাই ভারতের বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলেই ইহা যখন সুসাধ্য হইতে পারে, তখন মরণের পথ ছাড়িয়া শক্তিমান্ হইয়া বাঁচিয়া থাকার জন্য কত দিন আমরা ইহা উপেক্ষা করিব! এসিয়া মহাদেশ জয় করিয়া লইল যে মহাশক্তি, তাহা আজ আর হাসিয়া উড়াইবার নহে।

জাপান, পারস্য, তুর্ক, চীন, আফগান, আজ ক্ষুদ্র শ্যামও স্বাধীনতার জয়চ্ছত্র উড়াইয়া আমাদের স্তম্ভিত করিয়াছে—ইহা বিচিত্র নয়। আজ যে মহাজাতি রাজসূয় যজ্ঞের ঘোড়া

ছাড়িয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছে, তাহা যদি কেহ আটক না করিয়া পূজার অর্ঘ্যে আপনার বলিয়া স্বীকার করে, বিশ্বজয়ী সে মহাসম্রাটের চরণতলে স্বাধীনতার অসংখ্য মণিময় মুকুট যে ঝলমল করিয়া জগতের শোভার কারণ হইবে, ইহা কি অসম্ভব কথা! ভারতের সমস্যা---তাহারও যে একটা দিগ্বিজয়ী ক্ষুধা ছিল, সেও যে একদিন ভারত-সভ্যতার তীব্রগামী তুরঙ্গ দেশ-দেশান্তরে ছুটাইয়া পশ্চাতে রাষ্ট্রসংহতির মুক্ত কৃপাণ হস্তে দৌড়াইয়াছিল। আজ তাহা ইতিহাস; কিন্তু ভাব যে অমর। অতীতের সবখানি অশরীরী মূর্ত্তি লইয়া তাহার প্রাণে যে দাবানল জ্বালিয়াছে—অশান্তির মূল এইখানেই। নির্যাতনের বিভীষিকা এই নিদান দূর করার জন্যই বীভৎস মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান, ইহার ভ্রুকুটি-কটাক্ষ আমাদের আত্মদান করিতেই সঙ্কেত করে, অন্যথা হইলে তিলে তিলে মৃত্যুর বিধান দিয়া যায়--ক্ষমা নাই, করুণা নাই, একান্ত নিরুপায় হইলে মাথা নত করিতেই হইবে।

পাশ্চাত্য ধীরে ধীরে নিজের সত্যে দৃঢ়তা লাভ করিয়াছে, অনুকূল পবন মিলিয়াছে। ভাগ্যলক্ষ্মীর বরাশীর্ব্বাদ পাইয়া তাহারা ছুটিয়াছে। আর আমরা—কদাকার, বাক্‌সর্ব্বস্ব, বিকৃত অতীতকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চাহি, শক্তি পাই না, স্বাস্থ্য পাই না, জীবন পাই না, নেশাখোরের মত বাজে বকিয়া মরি! জীবনের পরিচয় দিতে গিয়া দেখি---আগাগোড়া ভুল হইয়াছে; পাঁয়তাড়া যতদিন কষি, অন্ধ মৃতপ্রায় জাতি ততদিন আশায় বসিয়া থাকে। কাজের জগতে পা বাড়াইয়াই আছাড় খাই—দেশব্যাপী নৈরাশ্যে, অবসাদে কোমর ভাঙ্গিয়া যায়—

শুধুই ভাবের কথা, শাস্ত্রের কথা, হিন্দু মহিমার কথা, যোগশক্তির কথা কেহ শুনিতে চাহে না। অপরাধ যাহারা চিরদিন শুনিয়া আসিতেছে, তাহাদের নহে; যাহারা শুনাইয়াছে, জাতিকে আশা দিয়াছে—পাপী তাহারাই। এ জাতি তাহাদের দায়েই আজ আত্মহারা, আত্মবিসর্জ্জনে উদ্যত।

অন্যদিকে, নব নব জাতির কণ্ঠে মুক্তির রাগিণী ঝঙ্কৃত হইয়া ভারতের প্রাণে আশার তরঙ্গক্ষোভ তুলিতে সুরু করিয়াছে। উদীয়মান রুশ পতিত জাতির জাগরণ-মন্ত্র প্রাচ্যকে নূতন ছন্দে শুনাইয়াছে। প্রাচ্যজাতির এই ঘোরতর জীবনসঙ্কটের দিনে বাঁচার জন্য যে একটা মিষ্ট কথা বলিবে, তাহার দুয়ারেই সে বিকাইতে চাহিবে, ইহা ভাবা অসঙ্গত নহে। অতীতের সংঘর্ষ ছিল স্বার্থের সংঘর্ষ—কতটুকু মানুষের প্রাণশক্তি ইহার জন্য রক্ত পিপাসু হইয়াছিল, আজ আদর্শের জয়চ্ছত্র কপালে আঁটিয়া কোন জাতি যদি মরিয়া হইয়া উঠে, তাহার আমূল প্রাণ-শক্তি ইহার জন্য উদ্যত হইয়া কতখানি বিশ্বগ্রাসী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে, তাহা সূক্ষ্মদর্শী যাঁহারা তাঁহারা বুঝিবেন। সোভিয়েট রুশিয়া ইউরোপীয় সভ্যতা ও আদর্শ ছাড়া একটা নিজস্ব নূতন নীতিকে আশ্রয় করিয়াছে বলিয়াই তো বিশ্বের জাতি-সঙ্ঘে সে কক্ষচ্যুত; নতুবা তাহাকেও ইউরোপীয় শক্তিসমূহের সহিত সংযুক্ত হইতেই দেখা যাইত। জগতে ইউরোপীয় সভ্যতা, সোভিয়েট সভ্যতা ও প্রাচ্য-সভ্যতার সংঘর্ষ-কাল আসন্ন-প্রায়। সোভিয়েটও যে তাহার নূতন আদর্শ দিয়া প্রাচ্যকে সহজে জয় করিতে পারিবে, তাহাতে ঘোরতর সংশয় আছে। শক্তিহীন

যে, সেই স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলী দিয়া পরধর্ম্মের বোঝা মাথায় বহে। চীনের জাতীয় দলের মধ্যে ইহারই মধ্যে যে অনৈক্যের উৎপত্তি, তাহার মূলে সোভায়েট আদর্শ-প্রভাব হইতে চৈনিক জাতীয়তাকে রক্ষা করার প্রয়াস দেখা যায়। জাতীয়তার অন্যতম পুরোহিত চ্যাংকাই-জেক ইহার অগ্রণী—চীনের মত প্রাচীনজাতি তাহার যুগযুগান্তের বৈশিষ্ট্য বিপদের দিনে অপরের ক্ষণিক সাহায্যে হস্তান্তর করিতে পারে না, জাতীয় দলের এই আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলেই বুঝিতে হইবে, যে জাতির সত্য পরাজয় ঘটিল।

প্রাচ্যের দুর্দ্দিনটাই বড় কথা নহে; বড় কথা—সে যখন স্বার্থরক্ষায় আত্মহারা হইয়া সত্তার ধর্ম্ম ত্যাগ করে। এই বাংলাদেশেই রাজার জাতির অনুগ্রহ পাইয়া সৌভাগ্যশালী হওয়ার আশায় একদিন স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলী দিয়া খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করার স্রোতঃ বহিয়াছিল। সুখের বিষয়, ভারতের ধর্ম্মবীর্য্য রাজা রামমোহনকে আশ্রয় করিয়া সে স্রোতের প্রতিমুখে দাঁড়াইতে, সে প্রবাহের গতি রুদ্ধ হইয়াছিল। এইরূপ কোন জাতি যখন বহিঃ-সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় আপনার সত্যকে বিসর্জ্জন দেয়, তখনই সে জাতির মৃত্যু হইল বলিতে হইবে। প্রতীচ্য মনীষী বার্ণাডশ'র মত লেখকের মুখেও সেদিন শুনিলাম —প্রাচ্যের আদর্শ মানব-মুক্তির যদি অন্তরায় হয়, তাহা হইলে প্রাচ্যকে পাশ্চাত্যের আদর্শ বরণ করিতে হইবে, এ বিষয়ে উদাসীন থাকা শ্রেয়ঃ নহে। সংঘর্ষ-সৃষ্টির মূলে যে জাতির বহিরঙ্গ স্বার্থই সবখানি নহে, সত্তাকে জয় করার অন্তঃপ্রেরণাই মূল কারণ, এই সকল উক্তি তাহারই প্রমাণ।

ইউরোপ অথবা নব সোভায়েটের রাষ্ট্রশক্তি যদি আজ স্ব স্ব আদর্শের শ্রেষ্ঠতা বোধ হৃদয়ে লইয়া করুণার সাহায্য-হস্ত বাড়াইতে কোথাও উদ্যত হয়, বুঝিতে হইবে—সে সহায়তা ঔদার্য্যের লক্ষণ নহে। একজনের ধর্ম্মে অপরকে দীক্ষা দেওয়ার যে তৃপ্তি, তাহা অসংখ্য প্রাণ-বলির বিনিময়েও যে অর্জ্জন করায় সুখ আছে। প্রাচ্যের জাগরণ-যুগে যদি আশু মুক্তির মোহে কঠোর বাস্তব সত্য কোন জাতি উপেক্ষা করে, তাহার ভবিষ্যৎ নিরাপদ্ নহে। বর্ত্তমানের অন্তরায় দূর করিতে আমাদের নিজেদের কিছু করার আছে কি না, আজ তাহাই দেখিতে হইবে। জলমগ্ন ব্যক্তিকে তিরস্কার করিয়া লাভ নাই; রক্ষার আয়োজন কিছু করিতে পারি কি না, বিচার করিতে হইবে। যে উপায় নির্দ্ধারণ করিব, তাহা আমাদের আত্মদানে, আমাদের জীবনের সামর্থ্য দিয়া পালন করা সাধ্যে কুলাইবে কি না? যদি ইহাতে সংশয় থাকে, আজ যে কোন প্রবল হস্ত ধরিয়া আমাদের বলিতে হইবে, 'ভারতের এই অচলায়তন ভেদ করিয়া হে মহাগুরু, তুমিই আমাদের রক্ষণ-কর্ত্তা. আমরা ভ্রান্তমতি, বহু দেবতার আরাধনা করিয়াছি, অব্যক্তাসক্ত-চিত্ত হইয়া বহু ক্লেশ পাইয়াছি। মূর্ত্ত দেবতা, অনেক বাধা উপেক্ষা করিয়া সত্যই করুণাময় মূর্ত্তিতে অন্ধকার হইতে আমাদের আলোর পথে লইয়া চল।'

যদি এই আত্মসমর্পণ-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে বাধে, তবে বুঝিতে হইবে, যে হয় অন্ধতার ভোগ এখনও শেষ হয় নাই, নয় সত্যের মধ্যে যে অমৃত আছে তাহার আকর্ষণ হইতে দূরে যাওয়া

সম্ভব নহে। অন্ধতা আঘাতের ব্যথায় অধিক দিন স্থায়ী হইবে না; কিন্তু ভাবের বীর্য্য যদি অমর হয়, তবে মৃত্যুর কশাঘাত মাথায় বহিয়াও এই সত্যই জয়যুক্ত হইবে।

আমরা এই পথই শ্রেয়ঃ বোধ করি। প্রাচ্যের সর্ব্বত্র আজ যাহা ঘটিতেছে, তাহা এই সত্যের মূল দৃঢ় করার আয়োজন ছাড়া অন্যরূপে আমরা দেখি না। হিংসাবৃত্তি জাগাইয়া যে জয় অধিকার করা হয়, হিংসার প্রতিঘাতে সে অধিকার চ্যুত হওয়া অসম্ভব নহে। এক পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতে গিয়া অন্য পাপের আশ্রয় কখনও প্রতিক্রিয়া-মুক্ত হয় না। ভারতের অহিংসামন্ত্রের ঘোষণা এই দুর্দ্দিনে তাই উপেক্ষার বস্তু নহে। বহির্জগতে নৈসর্গিক লক্ষণ সকল দেখিয়া এই নীতির বিরুদ্ধ-বাদ প্রচার অপ্রত্যাশিত নয়; কিন্তু প্রাচ্যের সাধনা বীর্য্যহীন নহে, ইহার পশ্চাতে একটী অদৃশ্য সুমহীয়সী শক্তি আছে, যাহা পরিণামে অতি বড় বিষধর সর্পকেও যেমন সম্মোহন-মন্ত্রে স্তব্ধ করা যায়, তেমনি জগতের পশুবলকে নিরস্ত করিবে। ভারতের সাধনা প্রাচ্যেরই ঘনীভূত কল্যাণপ্রতিমা—ভারত তাই প্রাচ্যের সত্যই কোহিনুর-মণি। যুগপ্রভাব হইতে আত্মবৈশিষ্ট্য রক্ষার শ্রেষ্ঠ নীতি ভারতই জীবন দিয়া আবিষ্কার করিয়া প্রাচ্যকে শিখাইবে। তাই প্রাচ্যের অগ্রগতির মূলে ভারতের এই দৃষ্টি ও সৃষ্টির তপস্যা যে যথাকালেই আত্মপ্রকাশ করিবে, সে সম্বন্ধে আমাদের সংশয়মাত্র নাই।

"প্রাচ্যের জাগরণে"—তরুণ গ্রন্থকার এশিয়ার পতিত জাতির মুক্তি-চিত্র আঁকিয়াছেন। চিত্রগুলি নূতন দৃষ্টি দিয়া

এই জাগরণেতিহাসের মর্ম্মাধ্যয়নের ফল, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। ভারতীয় মস্তিষ্ক ও চক্ষু লইয়াই ভারতের নবজাতিকে বিশ্বের জীবন-জোয়ারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে—তাহার চিরাশ্রয় আত্ম-ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে চলিবে না—এই মর্ম্ম-শিক্ষার সঙ্কেতটুকু ভারতকে ধ্যানান্তরালে রাখিয়াও নবীন লেখক কতটুকু ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন, তাহা সুধীগণের বিচার্য্য। যে বিশ্বাস, যে প্রাণের দরদে ভরিয়া তিনি এই কাহিনীগুলি শুনাইয়াছেন, আমি আশা করি, তাহা সকলেরই প্রাণ স্পর্শ করিবে। ভারতের তরুণ এই প্রাচ্যের জয় সঙ্গীত-শ্রবণে উদীয়মান নব জাতির খাঁটি জীবন-রাগিণীই নিজের প্রাণের তন্ত্রীতে মিলাইয়া পাইবে, এ আশাও দুরাশা নহে।

শ্রীমতিলাল রায়

"আমরা আজ মানুষের ইতিহাসে যুগান্তরের সময়ে জন্মেছি। ইউরোপের রঙ্গভূমিতে হয়তবা পঞ্চম অঙ্কের দিকে পট-পরিবর্ত্তন হচ্ছে। এশিয়ার নব জাগরণের লক্ষণ এক দিগন্ত হতে আর এক দিগন্তে ক্রমশঃই ব্যাপ্ত হয়ে পড়লো। মানবলোকের উদয়-গিরি-শিখরে এই নব প্রভাতের দৃশ্য দেখ্‌বার জিনিষ বটে—এই মুক্তির দৃশ্য! মুক্তি কেবল বাইরের বন্ধন থেকে নয়, সুপ্তির বন্ধন থেকে, আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসের বন্ধন থেকে।

আমি এই কথা বলি—এশিয়া যদি সম্পূর্ণ না জাগ্‌তে পারে, তা'হলে ইউরোপের পরিত্রাণ নেই।"

—রবীন্দ্রনাথ

বিষয়-সূচি

চিত্র-সূচি

প্রাচ্যের জাগরণ

জাপান

প্রাচ্যের কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়াছে। ধর্ম্মভূমি এশিয়া জাতীয়তার লীলাভূমি-রূপে বিশ্বের জীবনযন্ত্রে ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে সাড়া তুলিয়াছে। মহাশক্তির চিহ্নিত তপঃক্ষেত্র এশিয়া মুক্তির লীলাভিসারে আগুয়ান—দলে দলে তীর্থযাত্রীর কণ্ঠে জয়ধ্বনি আকাশে বাতাসে সংক্রামিত—কল-কোলাহলে জগৎ মুখরিত—জয়টীকা আজ প্রাচীরই ললাটে—সারি সারি আজ নবজাতির অভিযান বিশ্বমানবের নব-জন্ম-বার্ত্তাই ঘোষণা করিতেছে। এই যুগান্দোলনের কেন্দ্র-তীর্থ—ভারতবর্ষ। কিন্তু যুগপ্রভাতের প্রথম উষা-রাগ যাহার ভাল উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল, সে দ্বীপ-রাণী তরুণ জাপান। এশিয়ার এই পূরবী কন্যা, ভারতের পূর্ব্ব-শিষ্যা জাপানের অভ্যুদয়-কাহিনী সত্যই বিস্ময়কর। জাপানের সাধনা জাতির জাগ্রত ইচ্ছাশক্তিরই বিজয়ী উদাহরণ। যে জাতির প্রাচীন ধর্ম্ম, প্রাচীন তপস্যা, প্রাচীন গৌরবময় কৌলীন্য অন্তরে

মহাবীর্য্যরূপে চির-সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহার পক্ষে সেই মহাশক্তি প্রয়োগ করিয়া যুগের দানকে আত্মসাৎ করা আদৌ কঠিন কর্ম্ম নহে। জাপান তার সমাজ, রাষ্ট্র, শাসনতন্ত্র যুগশক্তির প্রভাবে ভাঙ্গিয়া গড়িতে চাহিলেও, জাপানের অন্তর-লক্ষ্মী পাশ্চাত্যের সিংহদুয়ারে চির পরাজয়ের গ্লানি বরণ করিয়া লইবে না, ইহা অবধারিত। জাপান ঘুমন্ত এশিয়ার নিদ্রাভঙ্গের আয়োজনে, পাশ্চাত্যের দিগ্বিজয়ী সভ্যতার প্রবল আক্রমণ রুদ্ধ করিয়া যে জাতিশক্তির পরিচয় দিয়াছে, তাহা এশিয়ার অখণ্ড মহাশক্তিরই ক্ষীণ বিদ্যুৎ-স্ফুরণ। এই বিন্দু-শক্তির বিকাশে জগতের ইতিহাসে যে ওলটপালটের সূত্রপাত হইয়া গিয়াছে, তাহার সুদূরব্যাপী পরিণাম কে নির্ণয় করিবে? জাপান বা চীন ভারতের পরিত্যক্ত ধর্ম্মবীর্য্যের চূর্ণাংশ মাত্র ধারণ করিয়া যে অভিনব সাফল্য দেখাইয়াছে, তাহাতে প্রাচ্যেরই বিভূতি ও গরিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহারই সম্পূর্ণত্ব-কল্পনায় আমরা ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবধারিত ধারণায় কি উপনীত হইতে পারি না?

জাপান আজ স্বাধীন, জাপান আজ শক্তিশালী, ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রাচ্যের সে অগ্রণী রাষ্ট্র। জাপানের স্থান বিশ্বের রাজদরবারে বরণীয়, সম্মানার্হ, গৌরবপূর্ণ। অর্দ্ধ শতাব্দীও হয় নাই, জাপানকে লক্ষ্য করিয়া ভারতের কবি ক্রন্দনের সুরে গাহিয়াছিলেন—

"চীন ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

পরে 'অসম্ভব' কথা পরিবর্ত্তন করিয়া 'ক্ষুদ্র সে' কথা বসাইয়া দিতে হয়, যখন রুশ-জাপ-সংগ্রামের শেষে জাপানের অভ্যুদয়-সূর্য্য সহসা প্রাচ্যগগন উদ্ভাসিত করিয়া দিগন্তে ঝলসিয়া উঠিল। তাই এবার কবি উল্লাসের গান গাহিলেন তরুণ ভারতকে হাঁক দিয়া—

"এস শীঘ্র এস, বেলা বয়ে যায়
এনেছে জাপান উষা এশিয়ায়;
মধ্যাহ্ন গরিমা স্বাধীন ভারত
আনিবে নিশ্চয় আনিবে।"

এ ছন্দ সেদিন শুনাইল অধিকতর সত্য, স্পষ্টতর সঙ্কেতময়। জাপানের জয়-সঙ্গীতে সারা প্রাচ্য সেদিন প্লাবিত কল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বের ইতিহাসে, সে এক অপূর্ব্ব, অভাবনীয় ঘটনা!

জাপানের স্থান এশিয়ার মাতৃক্রোড়ে; কিন্তু ভারত-ভারতীরই ধর্ম্মামৃত-স্তন্যপানে তাহার অধ্যাত্ম জন্ম, ইহা বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। এই ভারত যে চীন, জাপান, সকলেরই ধর্ম্ম-মাতা, ইহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর সূচনাকালেই, ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের মহাপ্লাবন সুদর্শনদ্বীপে স্পর্শ করিয়া, জাপানের অন্তর-সত্তা প্রথম প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু জাপানের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠাতা—সম্রাট্ জিম্মু। ইনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০ শতাব্দীর মানুষ—রোমের অধীশ্বর জুলিয়াস সিজারেরই সমসাময়িক। জিম্মুর আবির্ভাব-কালে জাপান যে বন্য বর্ব্বর জাতির আবাসস্থান ছিল, তাহাদিগকে

বশীভূত করিয়া সম্রাট্ জাপ-সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯২ বৎসর পূর্ব্বের ইঁহারই রাজ্যাধিরোহণ-ঘটনা আজও জাপানে ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মহোৎসব-রূপে সারা জাতি স্মরণ করে। চীন ও কোরিয়াতেও যখন বিপুল শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল, তখনও জাপান ছিল রাষ্ট্রজগতে দুর্ব্বল শিশু মাত্র। ১৩শ শতাব্দীতেও মঙ্গোলিয়ান রণতরীবাহিনী বারবার জাপানের তীর-ভূমিতে আছড়াইয়া পড়িয়া জাপানকে বিত্রস্ত ও বিপর্য্যস্ত করিত। আবার ১৭শ, এমন কি সেদিন ১৯শ শতাব্দীতেও ইউরোপীয় নৌবাহিনীর উপদ্রব হইতে জাপানের সমুদ্র-তট মুক্ত ছিল না।

জাপ-সম্রাট্ জিম্মুর রাজত্বের পর বহু শতাব্দী ধরিয়াই আদিম সম্প্রদায়গুলি বিদ্রোহী হইয়া রাজশক্তিকে বিপন্ন করিয়া তুলিত। কিন্তু জাপ-জাতির অন্তর্নিহিত অসীম রাজভক্তির গুণে সকল অন্তর্বিদ্রোহ দমন করিয়া, জাপানের রাজবংশ অখণ্ড প্রবাহে রাজশক্তির পরিচালনা করিয়া আসিয়াছে। এই দীর্ঘ যুগে, বহু শক্তিশালী উচ্চাকাঙ্ক্ষী সম্রাট্ জাপ-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, আবার অনেক দুর্ব্বলচেতাঃ নরপতিও জাপানের রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছেন; কতবার রাজবংশীয় শিশুর হস্তেও সাম্রাজ্য-ভার ন্যস্ত রাখিতে হইয়াছে—কিন্তু কোনদিন জাপানের প্রজাশক্তি রাজমহিমা ক্ষুণ্ণ করার স্বপ্ন পর্য্যন্ত দেখে নাই। জাপানের জাতি-চেতনা সম্রাট্কে কেন্দ্র করিয়াই আবহমানকাল বাড়িয়া উঠিয়াছে—এ পর্য্যন্ত একদিনের তরেও তাহার অন্যথা হয় নাই। জাপানে যে দীর্ঘ ঐতিহাসিক যুগ ধরিয়া সমুদায় সামরিক ও রাষ্ট্রীয় শক্তি "শোগুন" নামক সামন্ত সম্প্রদায়ের করায়ত্ত থাকে, সে

হিদেয়োশীর বংশধর ও বীর ইয়েয়াশুর সহতীর্থগণ টোকুগাওয়া-শোগুন শাসনাধীনে হীন সামন্ত-দশায় কাল যাপন করিতেছিলেন, সৎস্কমা ও চোস্থ, হিজেন ও টোসা প্রভৃতি রাজকুমারগণ তাঁহাদের অতীত গৌরব বিস্মৃত হইতে পারেন নাই—তাহাদেরই জমিদারীতে অত্যাচারপীড়িত বীরগণ আসিয়া দলে দলে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত সমস্ত জাপানের বীর-নেতা ও সুযোগ্য রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ ইহাদেরই বংশে ও রাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই বীরকুল হইতে জাপানের অগ্নিহোত্রী সেনানী ও সেনা যাইয়া অত্যাচারী শোগুনদের প্রতাপ নষ্ট করিল। অবশ্য শোগুন সামুরাইগণও—বিশেষতঃ, মিটো ও ইচিজেন রাজকুল এই সন্ধিযুগে জাতির সেই বিরাট ত্যাগ-যজ্ঞে যোগদান করিয়া অচিরে সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সে দিন দাইমো ও সামুরাই আবার এক সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া, তাহাদের চির উচ্চাধিকার সম্রাট্-চরণে উৎসর্গ করিয়া, স্বেচ্ছায় সকল প্রজার সহিত সমান অধিকার বরণ করিয়া লইলেন। জাপ-কৃষকের পার্শ্বে সেদিন জাপ-রাজকুমার ও অভিজাত-সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় নেতা আসিয়া বুকে বুক মিলাইয়া দাঁড়াইলেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! জাতীয় মিলনসাধনার এমন অপার্থিব, অভাবনীয়, রোমাঞ্চকর কাহিনী কোনও দেশে, কোনও যুগেই বুঝি প্রত্যক্ষ হয় নাই!

মেইজী বংশের রাজ্যকাল এই স্বদেশপ্রেমের অগ্নিময় উদ্দীপনায় সমুজ্জ্বল। স্বদেশপ্রেম—আজ জাপানের শ্রেষ্ঠ সাধন-রূপে পরিগণিত। ইহাই জাপানের জাতীয় ধর্ম্ম।

"দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ" —ইহা জাপানীর কণ্ঠে বেদ-মন্ত্রেরই ন্যায় জলন্ত ও মর্ম্মস্পর্শী। জাপান বালকে বালকে বুকের রক্ত ঢালিয়া এই দেশপ্রেমের মহামন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে—তাই জাপান আজ জগতে শ্রেষ্ঠ, প্রাচ্যের মহাজাগরণের আলোকহস্তে সর্ব্বপ্রথম তরুণ পূজারীরূপে সে জগতের চির বন্দনার সামগ্রী হইয়া থাকিবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি—মিকাডোকে কেন্দ্র করিয়াই জাপানের এই রাজধর্ম্ম জাতীয় চিত্ত মর্ম্মে মর্ম্মে অধিকার করিয়াছে। কিন্তু জাপানের টোকুগাওয়া-প্রবর্ত্তিত সার্ব্বজনীন শিক্ষান্দোলনও এই সর্ব্বস্তরব্যাপী জাতীয় জাগরণের জন্য কম দায়ী নহে। জাপানে বাধ্যকর প্রাথমিক শিক্ষাবিধান প্রচলিত করায়, এত শীঘ্র সমস্ত জাতির হৃদয় ও মন শিক্ষার আলোকে আলোকিত ও যুগবিপ্লবকে সে এমন সহজে বরণ করিয়া লইতে পারিয়াছে। আজ তাই জাপানে উচ্চ-নীচ-নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর সম্মিলিত চেতনায় একটা মিলনের রাগিণী ঝঙ্কৃত হইয়া জাপজাতিকে পৃথিবীর দুর্জ্জয় বীর-জাতিতে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে।

জাপানের শিক্ষা-যজ্ঞের প্রবর্ত্তক—যুকিচি ফকুওয়া। তিনি একজন সামুরাইয়ের সন্তান। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাহিত্যকে আত্মসাৎ করিয়া, জাতির বুকে নূতন প্রেরণার ঢেউ বহাইয়া আনিতে তিনিই ভগীরথের ন্যায় উদ্যম করিয়াছিলেন। ভারতের যুগপ্রভাতে যেমন রাজা রামমোহন রায় বাংলায় প্রথম ইংরাজী শিক্ষার আবাহন করেন, তেমনি জাপানে ইনিই সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী ভাষা স্বয়ং শিক্ষা করিয়া এবং আমেরিকা ও ইউরোপে দীর্ঘকাল

জাপান-সম্রাট

মংগুরা তোয়ামা

ভ্রমণ করিয়া বহু ইংরাজী গ্রন্থের জাপানী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে "কিওজি-জুকু" নামক যে অবৈতনিক শিক্ষালয়ের অঙ্কুর প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাই ভবিষ্যতে বিরাট্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। "জিজি শিম্পো" নামে জাপানী দৈনিক সংবাদপত্রেরও তিনি প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। "কোযুংশ্চা" নামে একটা সমাজসংস্কার-সমিতিও তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহনেরই ন্যায় তিনি জাপানের সেই সামন্ত-যুগেও প্রতিনিধিমূলক শাসন-তন্ত্রের আদর্শ প্রচার ও নারীর অধিকার স্থাপন করেন। জাপানবাসীর জন্য তিনি যে "নীতি-গ্রন্থ" রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মূলমন্ত্র—"আত্মসম্মান ও স্বাধীনতা।" জাপজাতির ধমনীস্রোতে এই মন্ত্র-বীর্য্যই রক্তের সঙ্গে বহমান। মহাত্মা ফুকাওয়াজার এই শিক্ষাদর্শ পরিশেষে স্বয়ং মিকাডো অনুমোদন পূর্ব্বক ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় অনুশাসন-যোগে তাহা জাতির জন্য বিধিবদ্ধ করেন। সেই অনুশাসনে দেশপ্রাণ সম্রাটের এই সুবর্ণময় আশার বাণী ছিল—"অতঃপর এমনভাবে শিক্ষা দেশব্যাপী করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে জাপানে কোন গ্রামেই আর একটীও অশিক্ষিত পরিবার থাকিবে না এবং সেইরূপ কোন পরিবারে একজনও নিরক্ষর লোক থাকিবে না।"

ক্রমে কিও বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে, জাপানে আরও বহুতর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ফুকুওয়াজার মৃত্যুর পরই জাপানের প্রথম নারী-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করা হইল। আজ সমগ্র জাপানে পাঁচটী সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও

ছয়টী বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ চূড়া গগন স্পর্শ করিয়াছে। এই সকল শিক্ষাপরিষৎ জাপানের শ্রেষ্ঠ মনীষার সম্মিলন-ভূমি—খাঁটি জাতীয় জীবনের অনুশীলন-ক্ষেত্র-স্বরূপ। আর এইখান হইতেই ক্ষুদ্র পল্লী হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দেশবাসীর মধ্যে স্তরে স্তরে প্রাথমিক, মধ্য, সাধারণ, কারিগরী ও শিল্পবাণিজ্য-সংক্রান্ত আদ্যোপান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা সুসংগতভাবে সঞ্চারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমোৎকর্ষ এখনও বিদ্যুদ্‌গতিতে অগ্রসর হইতেছে। জাপান এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে যে শিক্ষা-বিপ্লব সংসিদ্ধ করিয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

জাপানের অভ্যুত্থান অবশ্য নির্বিবাদে, একেবারে বিনা রক্তপাতে সাধিত হয় নাই। একদিন জাপানের সামুরাই বীরগণ—দাইমো ও শোগুনগণ পরস্পরের অধিকার লইয়া গৃহকলহে প্রমত্ত ছিল। শোগুন-নেতৃগণ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সামুরাইদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না; কেন না, তাঁহাদের আশঙ্কা—ইহাতে তাঁহাদের সামরিক প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হইবে। যাহারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান—চিকিৎসা, বস্তুবিদ্যা প্রভৃতি জানিতে উৎসুক ছিলেন, তাঁহাদিগকে অতি গোপন ভাবেই তাহা অনুশীলন করিতে হইত। ১৭শ শতাব্দীতে জেস্যুট মিশনারীগণের অত্যাচারের প্রতিশোধ দিবার জন্য শিমাবারার সমস্ত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের হত্যা করা হয় ও সেই সঙ্গে জাপানে বৃহৎ নৌনির্ম্মাণ এক প্রকার নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে, নবাগত পাশ্চাত্য বিদ্যা ও সংস্পর্শের বিরুদ্ধে এরূপ তীব্র অন্তরায় বর্ত্তমান থাকায়, জাপানে নতন সভ্যতার প্রবেশ বড় সহজে সম্ভব হয় নাই।

কিন্তু তরুণের জ্ঞানপিপাসা ইহাতে রুদ্ধ হইবার নহে। দক্ষিণের দাইমোগণ শোগুণের প্রতিপত্তি-হ্রাস ও এশিয়ায় ইংরাজ-জাতির বিস্তৃতি প্রতিহত করিবার জন্য ফরাসী যুদ্ধ-কর্ম্মচারী নিয়োগ করাই বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন। ইতিমধ্যে আমেরিকান কমোডর পেরী রণতরী লইয়া জাপানের উপকূলে উপনীত হইলেন। এই ঘটনায় যেন জাপানে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্রোতঃ শিলাহত বন্যাপ্রবাহের ন্যায় প্রবল উচ্ছ্বাসে দেশের বুকে ছড়াইয়া পড়িল। জাপান নূতন প্রাণের সাড়া পাইয়া উঠিয়া দাড়াইল বটে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অতীতের অনেক গৌরবময় সম্পদ্ হইতেও যেন সে বঞ্চিত হইল। নূতনের জন্য এই যে উন্মাদনা, ইহা প্রতি জাতিকেই বোধ হয় একবার পাইয়া বসে, কিন্তু এ মোহ বহুদিন স্থায়ী হইলে সর্ব্বনাশ হয়। জাপানের ন্যায় প্রাচ্যের সোহাগিনী কন্যা ভারত ও চীনের সহিত নিবিড অধ্যাত্ম সম্বন্ধ ভুলিয়া মদগর্ব্বিত ইউরোপের মন্ত্র-শিষ্য হইতে চলিল, ইহা যুগশক্তির অমোঘ প্রভাব তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাতে প্রাচ্যের আত্মা তৃপ্ত হইবার নহে। সে যাহা হউক, এই যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতার খর প্রবাহে ভাসিয়া জাপান মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিল—শুধু যুদ্ধবিদ্যা, রণসম্ভার, শিল্প ও বাণিজ্যের নীতি নহে; পরন্তু সেই সঙ্গে স্বীয় ধর্ম্ম, দর্শন, আদর্শের প্রতি বিমুখ হইয়া নির্ব্বিচারে প্রতীচ্যের আদর্শাদিও বরণ করিতে উদ্যত হইল। তাই দেখি—ষ্টীম এঞ্জিনের সঙ্গে জাপান অবলম্বন করিতেছে খৃষ্টধর্ম্ম, মেসিন গানের সহিত পাশ্চাত্য বেশভূষাও আমদানী করিতে সে বিরত নহে। জাপানের মনীষী রাজ-

নৈতিক নেতা ইওয়াকুরা, ওকুবো পাশ্চাত্যের চরণে আত্মবিক্রয়ের বিরুদ্ধে জাতিকে সতর্ক করিলেও, তাঁহারাও জানিতেন—যুগের উপযোগী ক্ষমতা ও যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইলে, কোন আত্ম-ত্যাগই যথেষ্ট নহে। আজও জাপান যুগের পরিবর্ত্তন বরণ করিতে অন্তরের বহু বিপ্লব আবাহন কবিতেও কুণ্ঠিত নয়। জাতির প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্য অটুট অব্যাহত রাখিয়া জাপান যদি পাশ্চাত্য ভাব ও বিভূতির সংহরণে সমর্থ হইত, তবে কোন কথাই ছিল না; কিন্তু পরস্ব আহরণ করিতে গিয়া যদি নিজস্বই বর্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার পরিণাম যে কদাপি শুভকর হইবে না, ইহা অবধারিত। জাপানের অধিষ্ঠাত্রী প্রকৃতির নিকট সমগ্র প্রাচ্য জগৎ আজ এই কামনাই নিবেদন করিতেছে।

জাপান ইংলণ্ডের ন্যায় অবিকল স্থান প্রাচ্যে অধিকার করিয়াছে। ইহা জাপানের প্রতি বিধাতার অভিশাপ কি আশীর্ব্বাদ, তাহা আজও নির্ণীত হইবার নহে। জাপানের ভৌগলিক সংস্থান যেমন তাহার দ্বৈপায়ন মনোবৃত্তির কারণ, তেমনি তাহার পারিপার্শ্বিক সন্নিবেশ তাহাকে এশিয়ার উপকূল-বর্ত্তী অন্যান্য মহাজাতিগুলি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে আত্মরক্ষার বিধানের উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছে। জাপানের এই অবস্থান, প্রকৃতি ও প্রয়োজন সবই হুবহু যেন ইংলণ্ডের সহিত মিলিয়া যায়। এই সৌসাদৃশ্যই রুষ-জাপ মহাসংগ্রামের পূর্ব্ব হইতেই উভয় শক্তিকে স্বার্থের দায়েই যেন পরস্পর কাছাকাছি টানিয়া আনিতে চাহিয়াছে। ফলে, আমরা দেখিতে পাই—তরুণ জাপান অতীতের ভাবমুক্ত হইয়া ব্যগ্র চিত্তে আত্মরক্ষার বিপুল

নৌবাহিনীগঠনে সমুদ্যত হইয়াছে ; সেই সঙ্গে সমগ্র প্রাচ্য-সমুদ্রে তাহার প্রবল প্রতাপ অক্ষুণ্ণ করিবার জন্য সে ইংলণ্ডেরই সাহচর্য্য ও উপদেশ খুঁজিতেছে। জাপানের সহিত বৃটনের প্রথম মৈত্রীবন্ধন হয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে। জাপান তখনও বৈদেশিক জাতিমাত্রের প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ-মুক্ত হয় নাই। এই বিদ্বেষ সখ্য-বন্ধনের পক্ষে পরম বাধা-স্বরূপ ছিল ; কিন্তু ক্রমে ইংলণ্ড জাপের জাতীয় বিদ্বেষ ও উদাসীনতা অতিক্রম করিয়া সন্ধি-পর্য্যায়ের শেষে উহা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিল। চীনের সহিত সংগ্রাম-কালে, ইংলণ্ড আন্তর্জাতিক নীতিতে জাপানের সাহচর্য্য করিতে বিরত হয় ; ফলে চীন-যুদ্ধের বিজয়-ফল আহরণে জাপান কতকটা বঞ্চিত হয়। কিন্তু ইহারও পরে, আবার নূতন মৈত্রী-সূত্র স্থাপিত হইতে দেখা গেল। তখন বুঝা গেল—ইংলণ্ডের সহিত জাপানের স্বার্থগত সামঞ্জস্য-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা তখনও ফুরায় নাই।

প্রায় ২০ বৎসর ধরিয়া এই ইঙ্গ-জাপ সন্ধির আয়ুঃ অব্যাহত থাকিয়া এশিয়ার শক্তি-সামঞ্জস্য অটুট রাখিয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জাপান তাহার জীবনমরণ পণ করিয়া রুষের সহিত মহা-সংগ্রামে নামিল। ম্যাঞ্চুরিয়ায় দৃঢ় পাদভূমি প্রতিষ্ঠা করিয়া রুষিয়া যখন কোরিয়ার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার চক্রান্তই আঁটিতেছে, তখন জাপান আর স্বীয় ভবিষ্যৎ ও সমগ্র এশিয়ার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া স্থির থাকিতে পারে নাই। মহাযুদ্ধে অতুল বল, বীর্য্য, রণকৌশল প্রদর্শন করিয়া জাপান শুধু সারা বিশ্বসংসারকে চমকিত করিল তাহা নহে, তাহার

সেই অকল্পনীয় বিজয়লাভে সমস্ত এশিয়ার শিরায় শিরায় আশা ও উল্লাসের বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিল, প্রাচ্য যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। এশিয়ার হৃদয়ে এই নূতন জীবন-স্পন্দন সত্যই একটা নবযুগের শুভ সূচনা করিয়াছে।

রুষের পরাজয়ে, আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রক্ষেত্রে ইঙ্গ-মার্কিন আধিপত্যও কতকটা নিষ্কণ্টক হইল। আবার গত মহাযুদ্ধে মিত্র-শক্তির সাহচর্য্য করিয়া যুদ্ধান্তে জাপান পুরস্কার তো কিছুই পাইল না; বরং সিঙ্গাপুরে বৃটন নৌভূমিকানির্ম্মাণের সূচনা করিয়া ইংরাজ ও মার্কিন নৌশক্তিকে পরস্পর অধিকতর সন্নিকৃষ্ট করিয়া তুলিল—ইহা জাপ-জাতির অস্তিত্বের পক্ষে বড় অনুকূল বলিয়া কখন মনে করা যায় না। ফলতঃ, জাপান যতই জলে স্থলে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বি-রূপে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, ততই ইংলণ্ডের সহিত তাহার মিত্রতা-বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিল। লণ্ডনে শুভাগমন-কালে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইলসন নিরর্থক এই খাঁটি কথাটুকু বলেন নাই, যে রক্তের সম্বন্ধই পৃথিবীতে সব চেয়ে বড়—তাই ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সে উভয় জাতি মিলিয়া অতি সুচাতুরীর সহিত জাপানকে হতাদর করিতে ত্রুটি করিল না। জাপানী রাষ্ট্রধুরন্ধরেরা সহজেই বুঝিতে পারিলেন, যে ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সে রণতরী-হ্রাসের প্রস্তাবনা শুধু জাপানের নৌ-শক্তিকে খর্ব্ব করা ছাড়া অন্য কোন অভিপ্রায়ে নহে। জাপানকে রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে এক-ঘরে করাই তাঁহাদের নিগূঢ় উদ্দেশ্য। তাঁহারা ইহাও বুঝিয়াছিলেন, যে ইঙ্গ-জাপ সন্ধিবন্ধন শুধু আমেরিকাকে সন্তুষ্ট করিতেই নাকচ করা হয় নাই; পরন্তু

জাপানকে বৃটনের ভবিষ্য শত্রুরূপে পরিগণনা করিয়াই সাম্রাজ্য-সম্মেলনে সেই প্রস্তাবনা স্পষ্টতঃ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শুধু বৃটনের এই অকৃতজ্ঞ আচরণে নহে, যুক্ত-রাষ্ট্রে জাপ-বহিষ্কার সম্বন্ধীয় যে আইন অনায়াসে বিধিবদ্ধ হইয়া গেল এবং দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার রাষ্ট্রপুঞ্জকেও এই একই ভাবে যখন এশিয়া ও জাপানের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা হইতে লাগিল, তখন তাহা হইতেও জাপানী রাষ্ট্রবিদ্‌গণ যথেষ্ট শিক্ষা পাইলেন। দূরদর্শী জর্ম্মন রাষ্ট্রবিৎ বিসমার্ক যে নীতির পূর্ব্বাভাস দিয়াছিলেন ও ভূতপূর্ব্ব জর্ম্মন-সম্রাট্ কাইজার যাহাকে "পীতাতঙ্ক" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহাই অবশেষে ইঙ্গ-মাকিন-গোষ্ঠী কার্য্যকরী প্রস্তাব বলিয়া বরণ করিয়া লইল। আজ কূট পাশ্চাত্য রাজনীতির খর আবর্ত্তে পড়িয়া জাপান নিজেকে কত বিচ্ছিন্ন ও অসহায় মনে করিতেছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ভাগ্যদেবতার আশীর্ব্বাদে এই ঘটনার মধ্য দিয়াই যদি জাপানের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় ও তাহার যথার্থ বন্ধু যে তাহার প্রতিবেশিবৃন্দ—"স্বাধীন ভারত, স্বপ্রতিষ্ঠ চীন ও জাগ্রত এশিয়া"—এই বোধটুকু জাগে, তবেই মঙ্গল।

জাপান বীর, জাপান স্বাধীন—কিন্তু তবুও সে যে এসিয়ারই অন্যতম জাতি; একথা ভুলিলে চলিবে কেন? জাপানের সাধনা—এশিয়ারই জন্য। এশিয়ার অগ্র-শক্তিরূপেই তাহাকে দায়িত্ব গ্রহণ ও স্বীয় জাতীয় সমস্যা পূরণ করিতে হইবে। জাপানের সত্যদর্শী ভাবুক ও প্রবীণ রাষ্ট্রবিদ্‌গণ জানেন—তাহাকে আবার শুধু অতীতের মহাদর্শে ফিরিলেই চলিবে না; পরন্তু প্রাচীন এশিয়া-জননীর হৃদয়ে যে গোপন ঐক্যরাগিণী এখনও

ঝঙ্কৃত হয়, তাহাই চেতনায় জাগাইয়া প্রাচ্যের মহাজীবন আবার প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে হইবে। তাই ঋষিপ্রতিম ওকাকুরার কণ্ঠে বেদের ন্যায় যে বাণী বাহির হইয়াছিল, তাহা জাপানকে আজ মর্ম্ম দিয়াই উপলব্ধি করিতে হইবে—"পাশ্চাত্য সমাজের শোকাবহ সমস্যাগুলির মীমাংসা পাইতে হইলে আমাদিগকে ভারতীয় ধর্ম্ম ও চীনের নীতিতন্ত্রের দিকেই অবধারিত দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে।"

এশিয়ার আশা, প্রাচ্যের বীরজাতি জাপান আজ পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রিয়, সাম্রাজ্যবাদের উপাসক, পরজাতিপীড়ক হইবে, না সত্যব্রতী, সত্যাচারী হইয়া প্রাচ্যজাতিসঙ্ঘের মধ্যে তাহার যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিবে? কোরিয়ার ন্যায় ক্ষুদ্র দুর্ব্বল জাতি আজ তাহাকে পরস্বাপহারী অত্যাচারি-রূপে অথবা মুক্তিদাতা বেশে অভিনন্দন করিবে? জাপান আজ এই প্রশ্নের যে উত্তর দিবে, তাহারই উপর এশিয়ার শান্তি ও জাপানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ভারতের চিরসত্য মহাবাণী স্মরণ করিয়াই বলিতেহয় :—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

* *
*

চীন

চীনও আজ জাগ্রত—প্রবুদ্ধ এশিয়ার শোভাযাত্রায় অন্যতম জয়যাত্রী। এশিয়ার এই অতি প্রাচীন জাতি শতাব্দীর পর শতাব্দীর ঘুমঘোর ভাঙ্গিয়া আশা-নেত্র মেলিয়াছে। মহাচীনের কণ্ঠে মুক্তির সিংহনাদ—জীবনের উদ্যত বীর্য্য সহস্রফণা নাগিনীর ন্যায় ভীমভৈরব তাথৈ তাথৈ নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে। কোথায় আজ পরাধীনতার নাগপাশ, কোথায় আজ প্রবলপ্রতাপ মাঞ্চু-শাসন! জাতির অন্তর্নিহিত মহাচেতনা যুগের ডাকে সাড়া না দিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে নাই—তাই চীনের মহা-দেবতার একটী হুঙ্কারে প্রাণহীন শান্তির মোহ-নীড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, চীনবাসী স্বাধীনতার সুখস্বপ্নে বিভোর। আজ এখনও যে চীনের অভ্যন্তরে পরিপূর্ণ মিলন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহা যে জাগরণেরই দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি স্বচ্ছ, শুদ্ধ, বিমল আধারের অভাবে ক্ষণে ক্ষণে শতধা চূর্ণ হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে—আবার সংযত হইয়া ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে—তাহারই লক্ষণ মাত্র। ৪০ কোটী বিচিত্র শ্রেণীর মানুষ—মহামানবের বিপুল অংশ—একদিনে তাহারা যে ঐক্যবদ্ধ হইয়া উঠিতে পারিতেছে না, ইহাতে সংশয়ের, নৈরাশ্যের কারণ নাই। চীন যদি আত্মসত্তা খুঁজিয়া পায়, শুধু রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিজাতীয় কর্ত্তৃপক্ষের

অধীনতা হইতে নহে, বিদেশীয় ভাব ও আদর্শের সূক্ষ্মতর প্রভাব হইতেও অচিরে মুক্ত ও নিরাময় হইয়া উঠিতে পারে, তবেই চীনের স্বাধীনতা অধিকতর সফল ও চিরস্থায়ী হইবে ; নতুবা মহাচীনের অদৃষ্ট-পট এখনও দুর্দ্দৈবের ছায়ামুক্ত নহে।

চীনের সুদীর্ঘ ইতিহাস মাস, সম্বৎসর ধরিয়া গণ্য নহে, শতাব্দী দিয়াই পরিমাপ্য। খৃষ্টপূর্ব্ব ২,৭০০ বৎসর পূর্ব্বেই চীনের ঐতিহাসিক যুগের সন্ধান পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব ২,৪০০ বৎসরের মধ্যে পাঁচজন আদর্শ নৃপতির কিম্বদন্তী মিলে। ইহার পর যে সকল রাজবংশের বিবরণ চীনের ইতিহাসে উল্লিখিত আছে, তাহাদের কাহিনী ক্রমে ক্রমে স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে। চীনের আদি যাযাবর সম্প্রদায়গুলি ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হইয়া বিভিন্ন রাজার অধীনে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। এইগুলি কালক্রমে একজন একচ্ছত্র সম্রাটের ছায়াতলে খণ্ড খণ্ড সামন্ত-রাজ্য-রূপে পরিণত হয়। এইরূপে রাষ্ট্রশক্তির কেন্দ্রীকরণ-ফলে, ১,৭৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে শাং-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। ১,১২৫ খৃষ্টপূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই বংশ রাজত্ব করিলে পর, চৌবংশ ২৫০ খৃষ্টপূর্ব্ব পর্য্যন্ত শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই দুই মহাবংশ লইয়াই চীনের ইতিহাসে সামন্ত-যুগের অবসান। শাং-যুগে চীনে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা ধর্ম্মগত, রাষ্ট্রীয় নহে। "দেবাবতার" সম্রাট্ স্বয়ং সারা চীনজাতির জন্যই যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তবুও, সে যুগেই চীনবাসী একই লিখিত বর্ণমালা, একই সভ্যতার অধিকারী, একই ভাবে দেশশত্রুর পরাজয়ে সমুৎসুক হওয়ায়

তাহারা যে বেশ একটা একতা লাভ করিয়াছিল, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

শাং-বংশের শেষ অত্যাচারী নৃশংস নৃপতি সপরিবারে অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিয়া স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন ও চৌবংশের প্রতিষ্ঠাতা উ-ওয়াং অতঃপর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। উ-ওয়াং তাতারবংশীয় হইলেও, অত্যাচারপীড়িত বিদ্রোহী প্রজা তাহারই সহায়তা করিয়াছিল। চৌ-সম্রাট্‌গণও শাং-সম্রাট্‌গণের অনুসরণে পোপের ন্যায় চীনের ধর্ম্মরাজ্যেও একাধিপত্য করিতেন; ক্রমে এই সাম্রাজ্যের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিলে, সামন্তগণ স্ব-স্ব-রাজ্যে স্বাধীন হইয়া উঠেন। এদিকে উত্তর ও পশ্চিমের হূণগণও চীনের ধর্ম্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। খৃষ্টপূর্ব্ব ৮ম হইতে ৯ম শতাব্দী পর্য্যন্ত শুধু হুয়াংহো ও ইয়াংটসি নদীর তীরান্তবর্ত্তী ভূখণ্ডে অন্যূন পাঁচ ছয় হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ব্যাঙের ছাতার ন্যায় গজাইয়া উঠিয়াছিল, এইরূপ শুনা যায়। চীনের ইহা ঘোর বিশৃঙ্খলাময় যুগ—যুদ্ধবিগ্রহে দেশ নিত্য অশান্তিময় হইয়া থাকিত। খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তিনটী রাষ্ট্রশক্তি মাথা খাড়া করিয়া উঠে—'ৎসি, 'ৎসিন ও চু'। ইহাদের মধ্যে চু'দের বিরুদ্ধে অন্যান্য শক্তিগুলি সম্মিলিত হইয়া শতবর্ষ ধরিয়া শান্তি রক্ষা করে ও পরিশেষে চু'দের নিরস্ত্র করিয়া চীনে নূতন সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে।

শেষ চৌ-সম্রাটের নিকট হইতে 'ৎসিন রাজগণই ধর্ম্মদণ্ড কাড়িয়া লইয়া এই নববংশের প্রাধান্য স্থাপন করে। শি-হুয়াং-টি (প্রথম "বিশ্ব-সম্রাট্") চীনের অগষ্টাস। তাঁরই শাসনাধীনে চীনে

বিচ্ছিন্ন শতধাবিভক্ত সামন্তযুগের অবসান হয়। চীনের বিখ্যাত মহাপ্রাচীর ইনিই নিৰ্ম্মাণ করান। ইঁহার রাজ্যাবসানে, অন্তর্বিদ্রোহ ঘটিয়া চীনে হান-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইঁহাদের প্রতাপে সাম্রাজ্যের পূর্ব্বসীমা আরও বিস্তৃত হয় ও হুণ-শক্তি পরাভূত হয়। ইঁহাদের সময়েই চীনবাসী অন্যান্য সভ্য জাতির ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসিয়াছিল, তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রমে হান-বংশের প্রতিপত্তি হ্রাস পাইতে লাগিল। খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে এক দেশব্যাপী ভীষণ মহামারীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চীনে যে ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল, সেই ঝঞ্চাবাতে ছিন্নমূল তরুর মত হান-শক্তির পতন ও পুনরায় রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা দেখা গেল। চীন এই সময়ে আবার অসংখ্য খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল। এই সময়ে মনীষী লাওৎসির "ব্যক্তি-তন্ত্র সুখবাদ" নামক নাস্তিক দর্শন প্রচারিত হওয়ায়, রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে চীন ধর্ম্মবিশ্বাস হারাইয়া ঘোরতর চিন্তা-বিপ্লবে নিপীড়িত হয়। চীনের এই বিক্ষোভ-পূর্ণ যুগ "ত্রি-রাজ্য যুগ" বলিয়া অভিহিত। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে হুণ জাতির এক সভ্যতর শাখা শেন-সি প্রদেশে শাসন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিল। ইহাদের রাজ্য উত্তর চীন, এমন কি সুদূর সাইবিরিয়া প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহারা অনেকাংশে চৈনিক সভ্যতা ও রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। এই মিশ্রণজাত নূতন শক্তি সুই-বংশের মধ্য দিয়া অচিরে চীনের নব যুগ আনয়ন করিল। এই সময়ে চীনে সাহিত্যের নব জাগরণ ঘটিয়াছিল। সুই-বংশের পর, চীনে যে টাং-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা প্রায় তিন শতাব্দী কাল ধরিয়া টিকিয়াছিল।

চীন

এশিয়ার দীপ্ত গৌরবমণি মহাচীন কোথায়? সে চীনের মহাগুরু প্রাচ্যের কোহিনূর মহা-ভারত কোথায়? এশিয়ার গৌরব-রবির এই যুগব্যাপী অস্তাচল-শিখরে বিশ্রামের পর আবার নব অভ্যুদয়ের সূচনাকাল কি আজও আগত হয় নাই? প্রাচ্যের সেই শুভ লগ্নের জয়ভেরী যাহার কাণে বাজিয়াছে, প্রশ্নের সদুত্তর তাহার কাছে আজ স্পষ্ট, সমুজ্জ্বল, নিঃসংশয় হইয়াই ফুটিবে। প্রাচ্যের সুদিনের সঙ্গে, চীনেরও সুপ্রভাত আজ মঙ্গলশঙ্খ-নিনাদে ঘোষিত হইয়াছে। এই নব জাগ্রত চীনের প্রথম ঋষি ও রাষ্ট্রগুরু—সানইয়েৎ-সেন।

মীং-বংশের শেষ অপদার্থ সম্রাটের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রজাপুঞ্জ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে, তাহাদের নেতৃস্বরূপ লিজি চিং পিকিনের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। ইহা খৃষ্টীয় ১০০০ শতাব্দীর কথা। এই ঘটনায় চীনে তুমুল গৃহ-কলহের সৃষ্টি হইল। মীং-সেনাপতি উ-সান-কাই লিজি চিংকে রাজ্যচ্যুত করিতে তাতার-জাতীয় মাঞ্চুগণকে গোপনে ডাক দিলেন। এই বিশ্বাসঘাতী নীতির অবধারিত ফল—সাতবৎসরব্যাপী নানা যুদ্ধ-বিগ্রহের পরে মাঞ্চু-শাসন চীনে দৃঢ়মূল হইল। এই সুচতুর বিদেশী-রাজ দেশীয় "মান্দারিন" শাসনকর্তৃবৃন্দের সাহায্যে সারা চীনে একাধিপত্য বিস্তার করিল। দীর্ঘ দিন মাঞ্চুবংশীয় নৃপতিগণের শাসনাধীনে চীন একেবারে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছিল। পরাধীনতার দৃঢ় বনীয়াদ অটুট করিতে, জাতীয়তার মূলোচ্ছেদ করিয়া রাজাদেশে রাজভক্তি শিক্ষা ব্যতীত চীনবাসীর অন্য সমস্ত শিক্ষালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। মান্দারিণরাই দেশের

আইন কানুনের মর্ম্ম বুঝিত। সারা দেশ অন্ধ তমিস্রায় ডুবিয়া ইহাদের অবাধ অত্যাচারের লীলাভূমি হইল। চীনের একমাত্র সম্রাজ্ঞী রাণী ইহানালার শাসনকালে এই অত্যাচারের মাত্রা একেবারে সীমা ছাড়াইয়া উঠিল।

এই উৎপীড়ক রাজশক্তির হস্ত হইতে চীনকে মুক্তি দিয়া যিনি চীনে সাধারণ-তন্ত্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তিনিই চীনের মুক্তি-দাতা মহাপুরুষ—মহামতি সান। ইনি ক্যাণ্টন ও পর্ত্তুগীজ রাজ্য ম্যাকাও নগরের মধ্যবর্ত্তী কাংটং প্রদেশের একটী গণ্ডগ্রামে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। চীনেরা সাধারণতঃ বৌদ্ধ হইলেও, ইহার পিতা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন ও ধর্ম্মযাজকের কর্ম্ম করিতেন। সান বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে চীনের "তরুণ সঙ্ঘের" সহিত পরিচিত হন। তিনি চীনে সর্ব্বপ্রথম ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন পর-রাজ্যে চিকিৎসা-ব্যবসার হুকুম পাইলেন না, তখন ক্যাণ্টন সহরে আসিয়া তরুণ বয়সে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এই সময়ে চীনের অধিবাসি-বর্গ রাষ্ট্রীয় পীড়নে অতিষ্ঠ হইলেও, শাসনদণ্ডের ভয়ে কেহই সাহস-ভরে প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনে অগ্রসর হয় নাই। সানই প্রথম জ্বালাময়ী ভাষায় মাঞ্চুরাজ্যের উচ্ছেদ-কামনা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন। ধীরে ধীরে এই মুক্তি-পাগল সর্ব্বত্যাগী পুরুষকে ঘিরিয়া চীনের নবীন দল দেশের জন্য প্রাণপণ করিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার পতাকাতলে সমস্ত মুমুক্ষু চীন ব্যাকুল আগ্রহে সম্মিলিত হইতে ছুটিল। সানের এই অপূর্ব্ব প্রভাব দেখিয়া মাঞ্চু-গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধৃত করিবার আদেশ দিলেন।

চ্যাং কাইজেক

সানের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ১৮ জন দেশব্রতী লইয়া যে গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়, সেই দলের একা সান ছাড়া আর আর সকলেই ধৃত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। সান কিন্তু ইহাতে আশাহীন হইলেন না; ব্রতসাধনে একান্ত উদ্বুদ্ধ হইয়া বিদেশে প্রস্থান করিলেন। বিশ বৎসর ধরিয়া, সারা পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া তিনি চীনের মুক্তির জন্য বিরাট্ উদ্যোগপর্ব্বে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সানের সাধনা সিদ্ধ হইল। চীনের মুক্তি-মূর্ত্তি মহানেতা উদীয়মান মহাজাতির স্বপ্ন বাধা জাগাইয়া দেশময় অনলকুণ্ড জ্বালাইয়া তুলিলেন। সে দাবানলে মাঞ্চু-সাম্রাজ্য পুড়িয়া ছারখার হইল।

এশিয়ার এই যুগ পুরুষ কোটী কোটী তরুণ চৈনিকের প্রাণে জাতীয়তার নব দেবতা রূপে আজ পূজিত। তাঁর অসাধারণ চরিত্র, অমানুষ শ্রম, জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ কঠোর তপঃ-প্রভাব অসংখ্য বার পরাভব, নৈরাশ্য, ব্যর্থতা বরণ করিয়াও জাতির জন্য যে মুক্তির বেদী গড়িয়া দিল, তাহা আজও জাতীয় ঐক্যের বিজয়-তীর্থ হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁর অমর প্রেরণা চীনের ভবিষ্যন্নির্ম্মাণে উত্তর-পুরুষকে চিরদিন অনুপ্রাণিত করিবে, ইহা নিঃসন্দেহ। কোনও দুর্ঘটনায় সান নিরাশ হন নাই। চীনের ঘোর দুর্দ্দিনেও আশার আলো যিনি নয়নে জ্বালাইয়া দেশ-বাসীকে মুক্তির পথ দেখাইয়াছেন, তাঁহার জীবনাদর্শ প্রতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত জাতির হৃদয়ে দুর্জ্জয় আশা, বিশ্বাস ও আত্মদানের অনুপ্রেরণাই চিরদিন জাগাইয়া তুলিবে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে উচাং'এর যুদ্ধে সানের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত গণশক্তি জয়লাভ করিল। মাঞ্চু-সম্রাট্ সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। সমস্ত চীন অখণ্ড কণ্ঠে সানকেই রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত করিল। কিন্তু সান স্বেচ্ছায় এই সাফল্যের জয়মুকুট পরিহার করিলে, স্বনামধন্য ইয়াং-সি-কাই সভাপতি-পদে বৃত হইলেন। ইয়াং-সিকাই'এর পর, সেনাপতি লিইয়ং-হুং সভাপতি হন। তাঁহার কার্য্যকালে চীনদেশ সমধিক উন্নতি লাভ করিল।

এই সময়ে চীন তাহার আভ্যন্তরিক উন্নতিবিধানে যত্নবান্ হইল। চীনের মরা প্রাণে যেন জোয়ার নামিয়া আসিল। দেশের লুপ্ত শিল্পজগৎ দেখিতে দেখিতে পুনঃ-সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। তুলার ব্যবসায় জোর চলিল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাপড়ের কল স্থাপিত হইল। চীনের বন্দরে বন্দরে বাণিজ্য-তরী পাল তুলিয়া জলে ভাসিল—দেশ বিদেশে বাণিজ্যলক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ ছড়াইয়া দিতে ও তদধিক কুড়াইয়া আনিতে লাগিল। সানের নিজ হাতে গড়া যে শত শত তরুণ ছাত্র তাঁহারই উৎসাহে বিদেশ হইতে নানা জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণ করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারাই স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া দেশোন্নতিকর এই সকল কাজে প্রাণ ঢালিয়া দিল। কিন্তু বাণিজ্য-প্রতিদ্বন্দ্বী, ঐশ্বর্য্যলোলুপ ইউরোপের বিভিন্ন জাতির পক্ষে চীনের দিন দিন এই শ্রীবৃদ্ধি একান্ত চক্ষুশূল হইয়া উঠিল।

চীনের উপকূল ও বন্দরে বন্দরে ইহারা থানা পাতিয়াছিল। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জর্ম্মনী, বেলজিয়াম ও রুসিয়া দরদ-হীন মাঞ্চু-সাম্রাজ্যের আশ্রয়ে অবাধ বাণিজ্যের নামে চীনের

সহিত যে সকল অপমানকর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে নিজ বাসভূমেও চীনকে যেন পরবাসীর মতই থাকিতে হইত। বিদেশী বণিক্ চীনকে অহিফেন-সেবনে সম্মোহিত করিয়া স্বয়ং রাশি রাশি অর্থ লুটিতে লাগিল। তাহারা চীনেরই বন্দরে চীনা কুলীদিগকে অর্দ্ধসভ্য বলিয়া লাঞ্ছিত, নির্য্যাতিত করিতে লাগিল, শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় বন্দুকের গুলিতে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। চীনকে যেন ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইতেই ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ মনঃস্থ করিয়াছিল।

প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও, চীন এই সকল বৈদেশিক শক্তির স্বার্থপরতার নাগপাশ হইতে মুক্তি লাভ করে নাই। লোভের দায়ে ইহারা চীনের বুকে যে অপমান ও ব্যথার পীড়ন সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছিল, ক্রমে তাহা একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। শুধু ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ নহে—লজ্জার কথা, শক্তিশালী জাপানও একই লোভের দায়ে চীনের জাতীয় দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আপন সুবিধা করিয়া লইতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। বসবাস ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য চীনের ৫০টি বন্দর ও হাট ছাড়া ৩৪টী সহরে ইহারা যে Concession অর্থাৎ বিশেষ "অনুগ্রহাধিকার" আদায় করিয়াছিল, তাহারা সহজে সেই "মৌরসী পাট্টা" ছাড়িতে চাহিল না। চীনের রেলপথেও তাহারা জোর করিয়া অধিকার বসাইতে চাহিল।

নূতন চীনের জাতীয় শাসনতন্ত্র আজও এই বৈদেশিক সমস্যার হাত হইতে একান্ত মুক্তিলাভ করে নাই। ইহার উপরে

চীন গৃহকলহেও বিপন্ন। এই সমস্ত অন্তর্ব্বিবাদের মূল সূত্র অলক্ষ্যে উক্ত বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জেরই হস্তে সঞ্চালিত হয় বলিয়া অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক, সন্দেহ নাই।

চীনের এই নবজাগরণে ব্যবসায়ী ও ছাত্রগণই অগ্রণী। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে যখন চীনের উপর জাপান একবিংশ সর্ত্ত দাবী করিয়া জুলুম করিতে প্রস্তুত হয়, তখন নবজাত প্রজাতন্ত্র এই প্রবল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু করিতে অক্ষম হওয়ায় দেশের ছাত্র ও ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় একযোগে জাপানের বিরুদ্ধে আর্থিক বহিষ্কার-নীতি প্রয়োগ করে ও শাংটাং-ঘটিত ব্যাপারে অখণ্ড চীনের প্রতিবাদ জানাইবার ছলে প্যারিসের শান্তিসভা হইতে চৈনিক দূতকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিরাট্ ধর্ম্মঘট করে। ক্রমে এই জাগরণের চেতনা জাতির জনসাধারণের বুকে আরও ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়ে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে হংকং উপনিবেশে চীন নাবিকদের ধর্ম্মঘট হয়। উদ্দেশ্য— তথাকার কাষ্টম্‌স মেরিণ সার্ভিস সম্পূর্ণ জাতীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে আনয়ন করা ও এইরূপে স্বদেশবাসীর দারুণ অপমান, লাঞ্ছনা ও প্রতিশোধ গ্রহণ করা। চীনের জাতীয় শাসনতন্ত্র এই সকল ধর্ম্মঘটের উৎস নহে। ইহা গণশক্তিরই পরিচয়। ডাঃ সান-ইয়েৎ-সান যে 'কোমিংটাং' দল গঠন করিয়া চীনের মহাবিপ্লব সিদ্ধ করিলেন, তাহা এক্ষণে রুষের সহিত সম্মিলিত হইয়া চীনের জাতীয়তার মূলোচ্ছেদ করিবে কি না, কে জানে! আশা—চীনের বর্ত্তমান জাতীয় নেতা রাষ্ট্রপতি চিয়াং কাই-জেক সান-ইয়াৎ-সেনের যোগ্য উত্তরাধিকারী ও জাতীয়তারই অকপট পূজারী।

তিনি ডাঃ সানের ভগিনীপতি, কিন্তু মাদাম সান স্বয়ং তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছেন। চিয়াং-কাই-জেক চীনের প্রধান সমর-দেবতাগণকে ছলে, বলে ও কৌশলে পরাস্ত করিয়া দক্ষিণ চীনের রাজধানী ক্যাণ্টন সহরেই জাতীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মুকডেনপতি চাং-সো-লিন আজ পরলোকে, কিন্তু কাইজেকের অবস্থা এখনও ঘোরতর বিপৎ-সঙ্কুল। তাঁহার রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে জেনারেল ফেঙ্গের ন্যায় শক্তিশালী রণনেতৃগণ প্রবল চক্রান্ত পাকাইয়া তুলিতেছেন। যেরূপ শুনা যায়, তাহাতে মনে হয়—চীনের ভাগ্য এখনও ঘোরঘনঘটাচ্ছন্ন। চীনের জাতি-শক্তি আজ কোন যুগ-পুরুষকে আশ্রয় করিয়া জয়যাত্রায় অগ্রসর হইবে?

চীনের আশা ভরসার উৎস—ধর্ম্ম ও জাতীয়তার উপাসনা। একদল নূতন ভাবুক, চারণ, সাহিত্যস্রষ্টা এই নব জাতীয় ভাব-সঞ্চারে উদ্যোগী হইয়া চীনের জাতি-জীবনে সঞ্জীবনী সুধা ছিটাইতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে ডাঃ হুশির নাম উল্লেখযোগ্য। জাতীয়তা-ভাবসিদ্ধ চীন যেমন পরজাতির রাষ্ট্রীয় বন্ধন-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আজ মুক্তিঘোষণা সফল করিয়াছে, তেমনি স্বজাতির স্বাধীন স্বভাব ও স্বরূপটীকেই আবিষ্কার করিয়া চীনকে বরেণ্য, মহীয়ান্, শক্তিশালী, এশিয়ার গৌরব-স্তম্ভে পরিণত করিয়া তুলিবে—ইহা আশা করা কি দুরাশা?

নবজীবনের সন্ধিক্ষণে চীনের অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপা নারীশক্তিও আজ পুরুষের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মাদাম সান, কুমারী ফু-ফু-উং'এর ন্যায় নারী চীনের গৌরবকেন্দ্র। কুমারী ফু-ফু-উং

স্বয়ং সেনানী-বেশে ক্যান্টন-সেনাদলের পরিচালনাভার গ্রহণ করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছেন। ইনি চীনের জোয়ানদ'আর্ক বলিয়া প্রখ্যাত। স্বাধীনতা-ঘোষণার সঙ্গে চীনের পুরুষ যেমন অতীতের কুসংস্কার-চিহ্ন বেণী কর্তন করিয়াছে, তেমনি চীনের নারীও বদ্ধ পদ খুলিয়া দেশের ডাকে ঘরের বাহির হইয়াছে। জাতির খাটি মর্ম্মসত্তাকে আপনার মধ্যে জাগ্রত করিয়াই চীনের নরনারী ভবিষ্যৎকে মুক্তচিত্তে আবাহন করুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

পারস্য

চীনের ন্যায়, ইরাণও আমাদের অদূর প্রতিবেশী অতি প্রাচীন রাষ্ট্র। ইরাণও আর্য্য—আর্য্যজাতির এই শাখা পূর্ব্ব হইতে সঞ্চারিত হইয়া পশ্চিম এশিয়ার এই মালভূমি অধিকার করিয়াছিল—সে কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগে, তাহার সঠিক নির্ণয় অদ্যাপি হয় নাই। আর্য্য-শক্তির বিরাট মেধা ও প্রতিভা, ধর্ম্মবীর্য্য, সাম্রাজ্যপিপাসা, ঐশ্বর্য্য ও মহত্ত্ব পারস্যেও কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। জরথুষ্ট্রার জন্মভূমি পারস্যও একদিন জগজ্জয়ী সভ্যতার শক্তি ও পরাক্রম বুকে লইয়া সূর্য্যাস্ত-দেশে বার বার অভিযানে বাহির হইয়াছিল—বার বার পাশ্চাত্যকে পরাজয় মানাইয়া, ইউরোপের মূল গৌরব যে গ্রীস ও রোম, সেই দুর্দ্দম বীর-জাতির উন্নত শীর্ষ একাধিকবার এশিয়ার দুয়ারে পারস্যসম্রাটেরই ভুজবল ভূনত করিয়াছিল। এশিয়ার সে মহাগৌরবের দিনে পারস্যই প্রাচ্যসভ্যতার বিজয়পতাকা-বহনের গৌরব বহু শতাব্দী ধরিয়া আপন স্কন্ধে লইবার সৌভাগ্য ও অধিকার পাইয়াছিল। এশিয়ার এই ভারপ্রাপ্ত জাতির বীর্য্য খরকিরণপাতে ইতিহাসের বহু পৃষ্ঠা উজ্জ্বল ও কীর্ত্তি-সমলঙ্কৃত করিয়া পরে যে অন্ধকারে ডুবিয়াছিল, কঠোর তপস্যার বলে সেই ভীষণ দুর্ভাগ্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া আবার সে মাথা তুলিয়া

দাঁড়াইয়াছে। পারস্য আজ উন্নত, পারস্য আজ প্রাচ্যের শোভা-যাত্রায় সহতীর্থ জাতি ও রাষ্ট্র রূপে জয়গৌরবে অগ্রসর—নবীন পারস্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আজ এশিয়া-জননীর আননে আর একবার মুক্তির দীপ্তিময় হাসির স্মিত পুলকরেখা অঙ্কিত করিয়া দিল।

খৃষ্টজন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ব্যাবিলোনিয়ার অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া মিদিয়া যেদিন স্বাধীন সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিল, সেদিন পারস্য ব্যাবিরুষের শাসনমুক্ত হইল বটে, কিন্তু তার পরাধীনতার নিগড় ঘুচিল না। খৃষ্টপূর্ব্ব ৭ম শতাব্দীতে, পারস্য মিডিয়াসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তখন মিদিয়া জাতিই পশ্চিম এশিয়ার সাম্রাজ্যদণ্ড অধিকার করিয়াছে। পারস্যে আর্য্য-শাখার সপ্ত অনুশাখার প্রতিনিধিবর্গ তদধীনে রাজ্য শাসন করিতেছিল। এই সপ্ত বংশের মধ্যে আখিমিনীযগণই ক্রমে প্রধান হইয়া উঠিল। ৫৫১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ফার্স প্রদেশে, আখিমিনীয় বংশীয় নৃপতি বিচ্ছিন্ন পারসীক জাতিকে একত্র করিয়া স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ফার্স প্রদেশের নাম হইতেই ইরাণের নাম ফার্সীদের দেশ অর্থাৎ 'পারস্য'—ইহা সগৌরবে গৃহীত হইয়াছিল। ৫৫৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে এই বংশের দ্বিতীয় নৃপতি মহাপরাক্রমশালী সাইরাস মিদিয়ার পরাধীনতাশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, তাহাদের বিস্তৃত দেশ অধিকার ও একে একে আশিরিয়া, আফগানিস্থান, ব্যাবিলোন, লিডিয়া ও গ্রীস পর্য্যন্ত পার্শ্ববর্ত্তী সকল রাষ্ট্রশক্তিকে পদানত করিয়া বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিলেন। ইতিহাসে ইনি সাইরাস-দি-গ্রেট

মহম্মদের শিক্ষায় উহার অন্তর্ম্মুখ বিপ্লব বহির্ম্মুখী হইয়া জগতের বুকে এক নূতন প্রেরণা-রূপে সৃজন ও প্রলয় সাধন করিতে ধাবমান হইল। মহম্মদ পারস্য-বিজয়ে পাঠাইলেন মুসলিম সেনাপতি খলিদকে।

ইহার পর, আরবের রুদ্রবাহিনী প্রলয়বন্যার মত দেশবিদেশ ভাসাইয়া, কোরাণ ও কৃপাণের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিতে করিতে দিগ্বিদিকে ছুটিল। এশিয়ার দিগ্বিজয়ী শক্তি এই নূতন কেন্দ্রে সঞ্চারিত হইয়া আবার নূতন বেশে জগজ্জয়ে সজ্জিত হইল। পারস্যের শেষ সম্রাট্ স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার প্রয়াস করিয়াও, সফলকাম হইলেন না। পারস্যে জরথুষ্ট্রের ধর্ম্ম নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। পারস্য মুসলমানের পদানত হইল।

অবশ্য পারস্যের বুকে মুসলমান খলিফাগণের এই ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা একদিনেই সম্ভব হয় নাই। আরবগণ সহজে পারস্যের জাতীয় ধর্ম্ম গ্রাস করিতে পারে নাই। দূরদর্শী খলিফাগণ প্রাচীন জাতির জাতীয়তার মূল নিঃসার করিয়া দিবার জন্যই তিলে তিলে যে আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহারই সাক্ষ্য-স্বরূপ ধর্ম্মের উপর এই নিদারুণ অত্যাচার সহিতে অসমর্থ হইয়া দলে দলে যে জরথুষ্ট্র-ধর্ম্মাবলম্বিগণ পলাইয়া আসিয়া ভারতের শান্তি-শীতল উদার বক্ষে আশ্রয় লইলেন, তাঁহারাই অগ্নিপূজক পার্শী-নামে বর্ত্তমানে বিজ্ঞাত। ইঁহারা প্রভাবশালী সম্প্রদায়—আজ ভারতের জাতীয়তা-সৃষ্টির অন্যতম উপাদান-রূপেই তাঁহারা ধীরে ধীরে পরিগণিত হইয়া উঠিতেছেন।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ হইতে ৮ম শতাব্দী পর্য্যন্ত খলিফাদের প্রতিপত্তি-

কাল। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহাদের রাজধানী টেসিফোন হইতে বোগদাদে স্থানান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খলিফাগণের অস্তমান প্রভাবও ক্রমে ক্রমে শিথিলতর হইতে থাকে। ১০ম, ১১শ ও ১২শ শতাব্দীর মধ্যে আফগান সুলতান মামুদ পারস্য অধিকার করেন; তারপর দুর্দ্দান্ত তুর্কী-জাতীয় তোগ্রল বেগ সেলুজুক-বংশের শক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সেলুজুকগণের বিশাল সাম্রাজ্য পারস্য হইতে এশিয়া মাইনর, জর্জ্জিয়া ও আর্ম্মেনীয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল ও তাহাদের প্রভাব বোগদাদের খলিফাগণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই খলিফা-গজনভী-সেলুজুক-যুগ পারস্যের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার কাল হইলেও, উহার মধ্যে পারস্যের জাতীয় চিত্ত অপূর্ব্ব রসসাহিত্যের সৃষ্টি করে। এই তিন শতাব্দীর মধ্যে রুদাগীর হইতে আরম্ভ করিয়া ফার্দ্দৌসী, জালালুদ্দীন রুমী, গজ্জালী, জাঙ্গী, হাফেজ, নাসীর, খসরু ও ওমর খৈয়ামের অভ্যুদয়—প্রেম বৃন্দাবনের সহস্র পিক যেন এক কালে কূজন করিয়া উঠিয়াছিল। বাংলার বৈষ্ণবযুগের ন্যায় পারস্যের এই সুফী সাহিত্য ও সাধনার যুগ অপূর্ব্ব প্রেম ও কবিত্ব-রসে অভিষিক্ত ও সমুজ্জ্বল—বিশ্বের বুকে চিরদিনের জন্য ইহা অমর সৃষ্টির সমৃদ্ধিরাজি ভারে ভারে দান করিয়াছে। বৈষ্ণব বঙ্গেরই মত পরাধীন নারীত্ব-প্রাপ্ত মনোবৃত্তির ইহা এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তেমনি অপার্থিব রসামৃতের নির্ঝরস্নাত, লজ্জারুণরাগবিজড়িত, মধুর, করুণ, মনমাতান অভিব্যক্তি—মাধুর্য্যের আস্বাদে তাহা মনকে মাতায় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই আপনহারা জাতির বীর্য্যশৌর্য্যের রূপান্তরে

রসমদিরাপানে তরলীকৃত চরিত্রের ভয়াবহ পরিণামের কথা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিতেও হয়। বীর্য্যের সঙ্গে রসপিপাসা, মাধুর্য্যের সঙ্গে মহিমার একত্র সংমিশ্রণ না করিতে পারিলে, পারসীকের ন্যায় বাঙ্গালীরও চরিত্রে অসম্পূর্ণতা রহিয়া যাইবে। এই দুই জাতি তাই বুঝি ভাগ্য-দেবতার পরিপূর্ণ আশীর্ব্বাদ-লাভে দীর্ঘ যুগ বঞ্চিত রহিয়াছে। আজ পারস্য নিজের সে অভাব পূরণ করিয়াছে—ভারতের হৃদয়মণি বাঙ্গালী, তোমারও মুক্তিযাত্রা কি এমনি পূর্ণতর জীবন-প্রবাহ অনুসরণ করিয়া আজ আরম্ভ হইবে ?

পারস্যের দুদ্দিন ক্রমে আরও ঘনাইয়া আসিল। উপর্য্যপরি বহিঃ-শত্রুর আক্রমণের খরস্রোতঃ নিবারণ কয়ার ক্ষমতা বুঝি দেশে ছিল না! তুর্কের পর মোগল আসিল। ঝড়ের ন্যায় চেঙ্গিস খাঁর দুর্দ্ধর্ষ বাহিনী পারস্যের গিরিদরী দখল করিল—সম্মুখের কোন বাধা মানিল না। ১৩১৫ খৃষ্টাব্দে হুলাগু খাঁ বোগদাদ ধ্বংস করিয়া পারস্যে মোগল-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে তাতার-সর্দ্দার তৈমুরলঙ্গ চেঙ্গিসেরই পদাঙ্কানুসরণে পারস্যে আসিয়া শতাধিক বৎসরের পরাধীনতার শৃঙ্খল দৃঢ়তর করিয়া দিলেন। তৈমুরের সাম্রাজ্য-রেখা ভারতবর্ষ হইতে রুশিয়া ও মেসোপোটেমিয়া পর্য্যন্ত রক্তস্রোতঃ অনুসরণ করিয়া আঁকিয়া উঠিল।

সুপ্ত নিপীড়িত জাতি তবু স্বাধীনতার পিপাসা একেবারে হারাইল না। পারস্যের সিয়া-ধর্ম্মী তরুণ পুরোহিত ইসমাইল ১৮ বৎসর বয়সে বাকু-জয়ের পর অনতিবিলম্বে সারা পারস্য

অধিকার করিয়া সোফী-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের ৪র্থ সম্রাট শাহ্ আব্বাস পারস্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি বলিয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। তাঁহার জীবদ্দশায় পারস্যের সৌভাগ্যরবি গৌরবের তুঙ্গশিখরে আরোহণ করিয়াছিল।

১৮শ শতাব্দীর সূচনায়, সোফী-সূর্য্যও আবার ঢলিয়া পড়িল। সুযোগ বুঝিয়া আফগান-সর্দ্দারেরা সীমান্তে প্রবেশ পূর্ব্বক দেশে উৎপাত ও লুণ্ঠনাদি আরম্ভ করিল। ইহাদের অত্যাচারে পারস্য অতিষ্ঠ—তাহাদের কবল হইতে দেশকে উদ্ধার করিলেন পারস্যের এক তরুণ দস্যুসর্দ্দার—নাদিরকুলী। প্রতিভাসম্পন্ন মহাবীর নাদির পার্ব্বত্য সঙ্গীদলের সাহায্যে পারস্যবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া নূতন সাম্রাজ্যের ভিত্তিপাত করিলেন। নাদির-শাহের বিক্রমে তুর্কী, তাতার, ককেশস, রুশিয়া, সমগ্র মধ্য এশিয়া, এমন কি ভারতের মোগল-সম্রাট্ পর্য্যন্ত মস্তক অবনত করিল। কিন্তু ক্ষমতার মদিরাপানে ক্রমে পারস্যের মুক্তিদাতা নৃশংস অত্যাচারীতে পরিণত হইয়া পরিশেষে গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। নাদিরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরাট্ সাম্রাজ্য নিমেষে ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

ইহার পর দেশে আবার ঘোর উচ্ছৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দিল। কাজার-বংশীয় আগা মহম্মদ বিচ্ছিন্ন পারস্যকে এক করিয়া শান্তি আনিলেন। মহম্মদ গুপ্তাঘাতে নিহত হইলে, ফতে আলি শাহ্ সম্রাট্ হইলেন। এই সময় হইতেই ইউরোপীয় আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া পারস্যের প্রাণান্ত হওয়ার উপক্রম করিল। রুশ ও ফরাসীর মিলিত বাহিনী পারস্য

সম্রাট রেজা খাঁ পহ্লভী

সর্দার-ই-আসাদ

ও আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া ভারতাক্রমণে উদ্যত বুঝিয়া চতুর ইংরাজ তাড়াতাড়ি পারস্যের সহিত সন্ধিবদ্ধ হইল। রুশও চড়াও হইয়া পারস্যকে যুদ্ধে হারাইয়া অপমানকর সন্ধি করিতে বাধ্য করিল। এই সন্ধির ফলে, পারস্যের রাজনৈতিক অবস্থা অনেকখানি পাল্‌টাইয়া গেল। রুশের প্রভাব দিন দিন বাড়িয়া উঠিল। ভারতের ন্যায় পারস্যের রঙ্গমঞ্চ হইতেও ফরাসীশক্তি চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল. কাজেই একদিকে রুশ-ভল্লুক ও অন্য দিকে বৃটিশ-সিংহ—এই উভয় শক্তি পারস্যের উপর রুদ্রনেত্রে থাবা উঁচাইয়া পরস্পর টানাটানি করিতে লাগিল। অকর্ম্মণ্য সম্রাট্ মহম্মদ শাহের অদূরদর্শিতায় পারস্যের ভবিষ্যৎ আরও তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

তৎপুত্র নাসিরুদ্দীনের রাজ্যারম্ভে পারসীক সভ্যতার নূতন আধুনিক বিকাশ—নবোদিত বাব নামক ধর্ম্মসম্প্রদায় বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হইল। তাহাদের ষড়যন্ত্রে প্রধান-মন্ত্রী নিহত হওয়ায়, রাজশক্তি প্রতিহিংসার কালানল জ্বালিয়া তুলিলেন। নারী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে বহুসংখ্যক ধর্ম্ম-বিশ্বাসীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করায়, শাহের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া পারস্যের অন্তস্তলে এই সময়েই নূতন জাগরণের চেতনা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ হয়। এই শিক্ষাদীক্ষার রাষ্ট্রগুরু প্রসিদ্ধ বিপ্লবী জামালুদ্দীন আফগানী।

জামালুদ্দীন হামাদানের এক নগণ্য সৈয়দ-সন্তান। যৌবনের মুক্তিপিপাসু এই অসাধারণ প্রতিভাশালী যুবক গতানুগতিক ধর্ম্ম ও শাসনের কঠিন শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষকে মুক্তি দিবার

জন্য দুঃসাধ্যসাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। দেশে দেশে তিনি এই মুক্তির বার্ত্তা প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। এই অনির্ব্বাণ আগুন বুকে লইয়া তিনি ভারতেও আসেন। পারস্য ও তুরস্কের অসংখ্য যুবকের প্রাণে এই বিদ্যুন্মন্ত্রের পরশ দিয়া জামাল তাহাদিগকে নূতন যুগের আবাহনে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। ফলে, পারস্য সরকার তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া তুরস্কে নজরবন্দী করিয়া পাঠাইয়া দেন। ইঁহারই অন্যতম সহকারী প্রিন্স ম্যালকম। ইঁনি পারস্যের মন্ত্রী ছিলেন কিন্তু শাহের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়া পদচ্যুত হইয়াছিলেন।

জামালের শিক্ষা দীক্ষা অচিরে ফলপ্রসূ হইল। তাঁহার সম্পাদিত মুখপত্র "কানুন" বিভিন্নদেশে বিভিন্ন ভাষায় অগ্নিমন্ত্র-প্রচারে রত ছিল। ইহাতে শাহ ভীত হইয়া "কানুনের" পারস্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু ভাবের অমর বীর্য্য—কণ্ঠ চাপিয়া তাহা নিষ্পেষণ করা যায় না; পারস্যের শাসনসংস্কারের জন্য চারিদিকে একটা বিরাট্ সাড়া জাগিয়া উঠিল। এই সংস্কারের ইতিহাসই পারস্যের নব যুগের ইতিহাস। ইহা হইতেই আমূল অভিনব রাষ্ট্র-পরিবর্ত্তনের সূচনা।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই। পারস্যের অর্দ্ধ শত মোল্লা ও বণিক্ বৃটিশ দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিল—ক্রমে দলে দলে জন-স্রোতঃ আসিয়া তাহাদের দলবৃদ্ধি করিল। ২রা সেপ্টেম্বর ১৪,০০০ প্রজা সম্মিলিত কণ্ঠে অত্যাচারের প্রতিবিধান ও জাতীয় শাসনবিধি প্রবর্ত্তন করার দাবী জানাইয়া সম্রাট্কে ঘোষণাপত্র প্রেরণ করিল। "মজলিশ" ও "মাস্রুতা"—প্রতিনিধি-সভা ও নব শাসনতন্ত্র—

মন্ত্রধ্বনির ন্যায় নব জাগ্রত প্রজাশক্তির অখণ্ড কণ্ঠে এই দাবী শাহেনশাহ আর অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। নাসীরুদ্দিনের মৃত্যুর পর, দুর্ব্বল শাহ মুজাফরউদ্দীন তখন সিংহাসনে—৭ই অক্টোবর তারিখে তিনি মজলিসের শুভ উদ্বোধন করিলেন। ৩০শে ডিসেম্বর পারস্যের নূতন শাসনবিধানে পুত্র ও মন্ত্রী সহ শাহ স্বাক্ষর প্রদান করিলেন। পারস্যের নবীন জাতীয়তার এই প্রথম বিজয় প্রচণ্ড উৎসব সহকারে জাতি অভিনন্দন করিয়া লইল। ইহার পরেই মুজাফরের মৃত্যু হয়। কিন্তু নূতন শাহ মহম্মদ মীর্জা পিতৃ-কৃত এই অঙ্গীকারপত্র তাঁহার গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলেন না।

জাগরণের আগুন আবার ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। রাষ্ট্র-বিপ্লবের মহাপ্লাবনে পারস্য রক্তস্রোতে ভাসিল। তেব্রিজে প্রায় বৎসরব্যাপী অবরোধে জাতীয় পক্ষ যে বীর্য্য, সাহস, সহিষ্ণুতা ও অদম্য সঙ্কল্পের পরিচয় দিল, তাহা অভূতপূর্ব্ব! তিহারাণেও রুদ্রের ডমরু বাজিল, রণদেবতা তাথৈ তাথৈ নাচিয়া উঠিল। চারিদিক্ হইতে রাজসেনার অগ্নিবৃষ্টিতে অভিষিক্ত হইয়াও জাতীয় দল বিচলিত হইল না। তিহারাণবাসী জনসাধারণও তাহাদের সাহায্য করে নাই; কিন্তু তাহাদের অটল সঙ্কল্পের সম্মুখে অবশেষে রাজশক্তি পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। পারস্যপতি শাহেন শাহ সপরিবারে রুশ-সম্রাটের আশ্রয় লইলেন। যুবরাজ আহ্মেদ জাতীয় মজলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করিলে, তাঁহাকেই জাতীয় পক্ষ সম্রাট-পদে বরণ করিয়া লইল। প্রথম মজলিশের অধিবেশনের তিন বৎসর পরে, আবার নূতন মজলিশের

অধিবেশন—পারস্যের নব জীবনের সত্যই এবার ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হইল।

পারস্যের এই রাষ্ট্রবিপ্লবে জাতীয় সংগ্রামের প্রকৃষ্ট নীতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। নবজাতির এই সংবেগ যুগের উন্মাদ আবেগে সঞ্চালিত না হইয়া যথার্থ প্রাচ্য-জাতি-সুলভ ধীর গম্ভীর সুসংযত গঠনের পথেই পরিচালিত হইয়াছে—ইহাতে জাতীয় নেতৃগণের যথার্থ বুদ্ধিমত্তা, গভীর রাষ্ট্রীয় অনুভূতি ও পরিণাম-দর্শিতারই পরিচয় পাওয়া যায়। তরুণ শাহকে গড়িয়া লইবার অবসর আছে মনে করিয়া, জাতি সে ভার স্বহস্তে লইয়া স্বল্পায়াসে বিপ্লববহ্নি নির্ব্বাপিত করিতেই প্রথমে চাহিয়াছে—ইহা বড় কম রাষ্ট্রনৈতিক শুভবুদ্ধির লক্ষণ নহে। গণতন্ত্র আদর্শ যে মোহ জাগায়, তাহা পারস্য সহজেই এড়াইয়াছে, কিন্তু তাহার সম্মুখের মেঘ তখনও এত ঘনায়মান, যে এ পরীক্ষাও ভবিষ্যতে আরও অভিজ্ঞতা দিয়া পূর্ণতর করিয়া লইতে হইল, তাহাই পরে বলিব।

বিপ্লবের নেতা—সর্দ্দার-ই-আসাদ ইউরোপেই শিক্ষিত। পাশ্চাত্য কূটনীতির উৎস-কেন্দ্র তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি প্রাচ্যের আশা ও আদর্শ, প্রাচ্যের প্রেরণা ভুলেন নাই। তিনি এশিয়ার মানুষ, প্রগাঢ় মমতার দৃষ্টি দিয়াই এশিয়াকে বুঝিয়াছেন ও চিনিয়াছেন, প্রাচ্যের শ্রদ্ধা, সংযম, নিঃস্বার্থ ত্যাগমূলক আদর্শের দ্বারাই তিনি তাঁহার জাতীয়তার সাধনাকে নিয়ন্ত্রিত ও সুপরিণত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাই আসাদের নেতৃত্বে পারস্যের জাতীয়তা সিদ্ধ পথেই পা বাড়াইতে

পারিয়াছে। কিন্তু যুগের পরিচয়ে আরও কিছু অবদান-সঞ্চয় বাকী ছিল।

যুগপ্রভাতের সূচনা হইতেই যখন পারস্যের রাজশক্তির জাতীয় কল্যাণই লক্ষ্য ছিল না, দেশের নিঃস্বার্থ নেতৃবৃন্দ বিশ্বাসী বিদেশীয়দের হস্তে রাজ্যের বড় বড় পদগুলি অর্পণ করিয়া আত্মগঠনে মন দিয়াছিলেন। পারস্যের কাষ্টম, রাজস্ব ও যাবতীয় অর্থ-নৈতিক কর্ম্মবিভাগগুলি বেলজিয়ামবাসী বা আমেরিকাবাসী অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত কবার ব্যবস্থা হয়। মিঃ মর্গ্যান সাষ্টার আমেরিকান বিশেষজ্ঞ—পারস্যের বিধ্বস্ত রাজকোষ সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। স্বার্থপর রাজ-কর্ম্মচারিগণের দুর্ব্বুদ্ধিবশে পারস্য রুশ ও ইংরাজ, এই উভয় জাতির নিকট ঋণ লইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হয়; ইহা যে তার উত্তমর্ণের নিকট আত্মবিক্রয়ের ব্যবস্থা, তাহা বুঝিবার অবকাশ ছিল না। মর্গ্যান সাষ্টার ধনাধ্যক্ষ-রূপে হিসাব করিয়া দেখাইলেন—এখনও উপায় আছে; পারস্য বুঝিয়া চলিলেই অচিরে ঋণমুক্ত হইয়া আপনার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারে।

দুর্ব্বল ঋণভারপীড়িত পারস্যের ইহাতে দৃষ্টি খুলিল। কিন্তু তখন উত্তমর্ণ উত্তর ও দক্ষিণাংশে তার অজ্ঞাতসারেই লঙ্কাভাগের ব্যবস্থা করিয়াছে। রুশ ও ইংরাজ সাষ্টারকে চাহে না—শাহের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া পারস্যের এই অকপট বন্ধুকে তাহারা তাড়াইয়া ছাড়িল। পরে শাহ সিংহাসনচ্যুত হইলেন বটে; কিন্তু রুশ ও ইংরাজেব কূট রাষ্ট্রনীতি পারস্যকে মাথা তুলিতে সহজে দিল না। ১৯১২ সালে পারস্যের অবস্থা খুব শোচনীয়

হইল। নেতৃগণ নিরাশ হইলেন। ভাগ্যবলে মহাযুদ্ধ আসিয়া রুশ ও ইংরাজের মুষ্টি কিছু শিথিল করিল। সেই অবসরে নবীন জাতি ঘর গুছাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিল।

এই শুভদিনে যোগ্য নেতার আবির্ভাবে পারস্যে সোণা ফলিল। কসাক সেনাদল হইতে এক বংশাভিজাত্যহীন অপ্রসিদ্ধ লোক-নেতা—খাঁটি মানুষ—পারস্যের নবভাবকে আপনার মধ্যে বিগ্রহান্বিত করিয়া ধীরে ধীরে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পারস্যের তরুণ বাহিনীকে তিনি পরিচালিত করিয়া, নিজ যোগ্যতা-গুণেই রাজ্যের কর্ণধার হইয়া, পরিশেষে জাতীয় মজ্‌লিস্‌-কর্ত্তৃক সম্রাট্‌-পদে মনোনীত হইয়াছেন। বিলাসী, অকর্ম্মণ্য জীব আহ্মেদ শাহ্‌ প্যারিসের বিলাসাগার হইতে যখন প্রজার সহস্র ডাকেও সাড়া দিলেন না, আর ফিরিলেনও না, তখন পারস্যবাসী বাধ্য হইয়াই কাজ্জার-বংশের শেষ নিদর্শন মুছিয়া নব সম্রাট্‌কে বরণ করিয়া লইল। রেজা খাঁ পহ্লবী আজ যোগ্য হস্তেই পারস্যের রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছেন। প্রজার যথার্থ প্রতিনিধি, স্বাধীন পারস্যের প্রাণ-বিগ্রহ, জাতির আদর্শ শাহেন শাহ্‌ পারস্যকে জাতীয়তার জয়-গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিতেছেন—পারস্য আজ এশিয়ারই স্বাধীন-মহিমাময়ী কন্যা, এই সুসংবাদে আমরা পুলকিত।
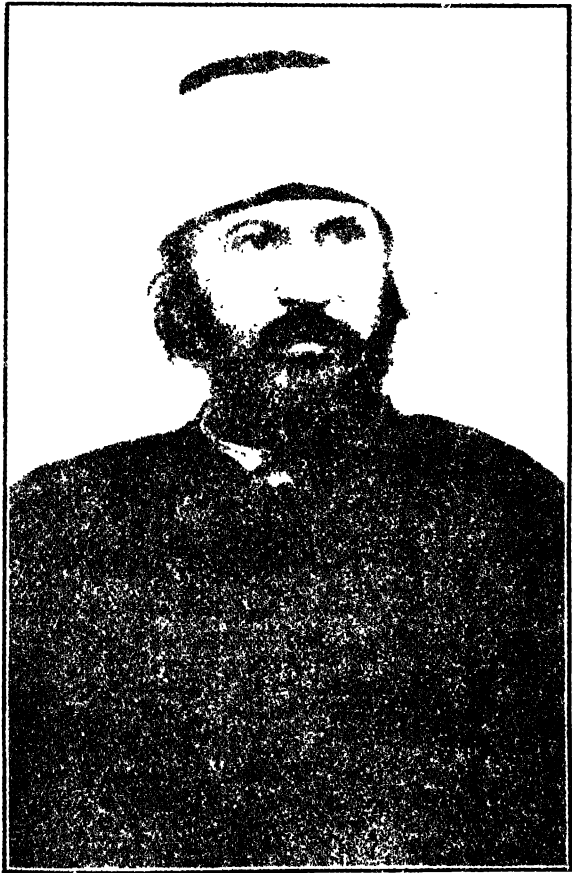
জামালুদ্দিন আফগানী

গাজী মুস্তফা কামাল পাশা

অর্জ্জন করেন। বাযাজাদের অসমাপ্ত অভিযান তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় মহম্মদ সম্পূর্ণ করেন। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে কন্‌ষ্টান্টিনোপলে মহম্মদ বিজয়-গর্ব্বে প্রবেশ করেন। এই কনষ্টান্টিনোপলের পতন ইউরোপীয় ইতিহাসের যুগান্তরসূচক ঘটনা। প্রাচ্যের নিকট পাশ্চাত্যের পরাজয়ের ইহা অবিসম্বাদিত জয়-স্তম্ভ।

মহম্মদ ইতালীজয়েও প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মৃত্যু ঘটায় ইতালী সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পাইল। মহম্মদের পুত্র দ্বিতীয় বায়াজাদ গ্রীসের প্রায় সমুদয় অংশ জয় করিয়া লইলেন, এমন কি পোলাণ্ড পর্য্যন্ত তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন। তৎপুত্র সেলিম আর্ম্মেনিয়াজয় ও মিশরকেও স্বীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন ইজিপ্টে অপদার্থ শেষ আব্বাসী খলিফা মামেলুক সুলতানের আশ্রয়ে নামে মাত্র খেলাফতের মহিমা-ধ্বজা বহন করিতেছিলেন, সেলিম ইঁহার নিকট হইতে "খলিফা" উপাধিটুকু ক্রয় করিয়া লইলেন এবং পয়গম্বরের পবিত্র পতাকা ও স্মৃতিচিহ্ন-সকল আয়ত্ত করিলেন। সেই অবধি ১৫১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে তুর্কীর অটোম্যান সুলতান ইসলাম-জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী খলিফা বলিয়া স্বীকৃত ও পূজিত হইয়া আসিতেছিলেন। সেলিমের পরে, "মহামহিম সুলেমান" অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া বাগদাদ্ হইতে হাঙ্গেরী পর্য্যন্ত বিপুল প্রতাপে শাসন বিস্তার করেন ও ফরাসীরাজ্যের সহায়তায় রাজধানী ভায়েন্নার দ্বারদেশে হানা দিয়াছিলেন। অটোম্যান তুর্কীর তাহা সমুচ্চ গৌরবযুগ বলিতে হইবে।

পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ইউরোপে প্রাচ্যের এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকার ১৫০ বৎসরের অধিক কাল গ্রীস, সমস্ত বলকান্ রাষ্ট্রগুলি ও দক্ষিণে রুশশক্তি মাথা পাতিয়া মানিয়া লইয়াছে। ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগে রুশসম্রাট্ ক্যাথারিণ-দি-গ্রেট এই বিরাট্ সাম্রাজ্যের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিতে প্রথম আঘাত দিবার ভরসা সঞ্চয় করেন ও এশিয়া মাইনর অভিমুখে অগ্রসর হন। কনষ্টাণ্টিনোপলই "দার্দ্দানালিশের চাবী" বলিয়া পরিচিত। নেপোলিয়নও জানিতেন—"এই রাষ্ট্র-কেন্দ্র যাহার অধিকারে থাকিবে, সমগ্র পৃথিবী তাহার মুঠার মধ্যে আসিবে।" তাই রুশের চির অভীষ্ট—তুর্কের হস্ত হইতে কন্ষ্টাণ্টিনোপল অধিকার করা। তুর্কীর সহিত রুশের বার বার শক্তি-পরীক্ষার ইহাই কারণ। সমস্ত খৃষ্টান ইউরোপের চক্রান্তের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা পূর্ব্বক তুর্কী পাশ্চাত্যে শক্তিসামঞ্জস্য অব্যাহত রাখিয়াছে—ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতি এই কারণে কনষ্টাণ্টিনোপল তুর্কের হস্ত হইতে রুশের নিকট হস্তান্তরিত হওয়া কোনও দিন বাঞ্ছনীয় মনে করে নাই। ফরাসী-সম্রাট্ নেপোলিয়ানও রুশের এই দুরাকাঙ্ক্ষা সমর্থন করেন নাই। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ক্রিমিয়া-যুদ্ধের পর, বার্লিন কংগ্রেসে ইংরাজ ও অন্যান্য শক্তিপুঞ্জ তুর্ক-সাম্রাজ্য-রক্ষায় সম্মত হন। কিন্তু এ সর্ত্ত বালির বাঁধ। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় গ্রীক-তুর্ক সংগ্রাম উপস্থিত হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে রুশ ও ইংলণ্ডের গোপন সন্ধির ফলে তুর্ককে ভাগবাটোয়ারা করিবার মতলব স্থিরীকৃত হয়। তখন তুর্কের সুলতান স্বেচ্ছাচারী আবদুল হামিদ। এই সময়েই নব্য তুর্কীর প্রাণে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। তুর্কের সর্ব্বনাশের জন্য

ইংরাজ ও রুশের এই মিতালী দেখিয়া নব্য তুর্ক আর বিলাসী স্থলতানের উপর দেশের ভাগ্য নির্ভর করিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। স্থলতান ঘরে বাহিরে বিপর্য্যস্ত ও বৈদেশিক চক্রান্তে নিরুপায় হইয়া সর্ব্বপ্রকারেই তুর্ক-শক্তিকে সঙ্কুচিত করিতে বাধ্য হইতেছিলেন। এই অপদার্থ সম্রাটের স্বেচ্ছাতন্ত্র থাকিতে নব্য তুর্ক বুঝিল—তাহার কল্যাণ নাই। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ২২শে জুলাই-এ নিয়াজি বে'র নেতৃত্বে বিদ্রোহ মাথা তুলিল। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য ইংরাজ ও রুশ প্রস্তুত ছিল না। তাহাদের সাধের "রেভেল প্রোগ্রাম" এক নিমিষেই বুঝি ফাঁসিয়া গেল!

পরদিবস আনোয়ার বে'র সভাপতিত্বে তুর্কের জাতীয় পক্ষ হইতে বিধিবদ্ধ রাজতন্ত্র ঘোষণা করা হইল। স্থলতান নিরুপায় হইয়া এই প্রস্তাবে কতকটা স্বীকৃত হইলেন বটে; কিন্তু তাঁহার স্বৈরাচারের নিয়ন্ত্রণে অন্তরে অন্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না। নব্যতুর্কী সম্প্রদায় জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী স্থলতানের নানা ষড়যন্ত্রের পরিচয় পাইয়া পরিশেষে চরম উপায় বরণ করিয়া লইলেন। তাঁহারা অচিরে কনষ্ট্যাণ্টিনোপল অধিকার করিয়া, আব্দল হামিদকে একেবারে সিংহাসনচ্যুত করিলেন। হামিদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহম্মদ রেশাদ এফেন্দী ৫ম মহম্মদ নামে স্থলতান-রূপে মনোনীত হইলেন। প্রকৃতপক্ষে, তখন "ঐক্য ও উন্নতি" সমিতির সভাপতি খ্যাতনামা আনোয়ার বে'ই জাতীয় পক্ষের নেতা ও রাষ্ট্রশক্তির কেন্দ্র-পুরুষ ছিলেন।

এত বড় একটা শান্তিময়, রক্তহীন বিপ্লব চক্ষের উপর দিয়া বহিয়া গেল—সমগ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগৎ এই ঘটনায় স্তম্ভিত হইল। নব্যতুর্কীর এই জাগরণ নবীন এশিয়ার আত্মবৈশিষ্ট্যের আর এক সমুজ্জ্বল উদাহরণ। তুর্কের অবস্থা অন্য দেশের অবস্থা নয়। দুর্ব্বল, অত্যাচারপীড়িত রাষ্ট্র কেমন করিয়া বিনা রক্তপাতে অন্তরে বাহিরে রূপান্তর সাধন করিয়া আবার নব জীবনের অধিকারী হইতে পারে, তুর্কের জাতীয় দল তাহাই সিদ্ধ করিয়া দেখাইয়াছেন। নব্য তুর্কের এই নেতৃমণ্ডলের বীর্য্য, মনুষ্যত্ব, নির্ভীক হৃদয়, স্বচ্ছ গভীর চিন্তাশক্তি, উদ্যত কর্ম্মপটুতা সমস্তই অনুকরণীয়। স্বৈরাচারী আবদুল হামিদ জিঘাংসু শক্তিপুঞ্জের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলী-স্বরূপ ছিলেন। কূট চক্রান্তই তাঁহার নীতি, গুপ্তচর-বিভাগই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল। এইরূপ হীন ষড়যন্ত্রবিধানে তিনি যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে এইটুকু কৃতিত্বের ভাগী করিতে পারা যায়, যে তাঁহার চক্রান্ত-ফলে, তুর্কী খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ইউরোপের মানচিত্র হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। তুর্কের জাতীয় পক্ষ যে নব বীর্য্যের পরিচয় পাইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা এই অপমানকর নীতির প্রভাব হইতে জাতিকে মুক্তি দিতেই চাহিয়াছে। নবীন তুর্কীর নেতৃগণ নির্ভীক, দৃঢ়চেতাঃ, স্পষ্টভাষী। এ সকল গুণই জাতীয় চরিত্রে বলবিধান করে, জাতিকে উন্নতি ও মুক্তির ঋজুপথে অকুতোভয়ে আগাইয়া চলিবার সামর্থ্য দেয়। তুর্কের জাতীয় তন্ত্র এই সাধন-বীর্য্য লইয়াই প্রতিষ্ঠিত হয়। তুর্কের আশা আকাঙ্ক্ষা, তুর্কের নব-জীবনলাভের অমর

প্রেরণা, তুর্কের স্বাধীনতা-রক্ষার অদম্য সঙ্কল্প—এক শক্তিমান্ পুরুষকে আশ্রয় করিয়া এই সময়ে আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক সমগ্র তুর্কজাতিকে নিশ্চিন্ত করিল—ইনিই যুগপুরুষ কামাল পাশা।

যে প্রাচ্য জাতির অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত বিজয়পতাকা একদিন ভায়েন্নার তোরণোপরি সগর্ব্বে উড়িয়াছিল, সমগ্র ইউরোপের সম্মিলিত উদ্যমে একে একে তার বিরাট্ বাহু ছিন্ন হইয়া যখন ক্রমেই "ন্যুলো" হইয়া পড়িতেছিল, যখন ইউরোপের খৃষ্টান-সমুদ্রে গোষ্পদতুল্য স্থান অধিকার করিয়া ইউরোপের "রুগ্ন মানুষ" (Sick Man of Europe)—এই ঘৃণাব্যঞ্জক আখ্যা অর্জ্জন করিয়া কোন রকমে মাথা গুঁজিয়া সঙ্কটময় দিন ক্ষেপণ করিতেছিল, তার পর জার্ম্মাণীর মিত্ররূপে পাশ্চাত্যের কুরুক্ষেত্রে নামিয়া কাইজারের পরাজয়ের সঙ্গে যখন তুর্কীর ভাগ্যচক্রও অধঃপতনের চরম স্তরে গিয়া পৌছিল, তুর্ককে তখন নিশ্চিহ্ন করিতেই শক্তিপুঞ্জ কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিল। এই ঘোর দুর্দ্দিনে, উদীয়মান সূর্য্যের মত এই প্রাচ্য-বীরের অভ্যুত্থান মুহূর্ত্তে অন্ধকার দূর ও তুর্কের প্রাণে সত্যই নবশক্তি সঞ্চার করিয়াছে। আজ তুর্ক আর জগতে কাহারও উপেক্ষার বস্তু নয়, ঘৃণার বস্তু নয়, অবজ্ঞার পরিবর্ত্তে সম্মান বিশ্বের দরবারে আদায় লইতে তুর্ক আজ বীর-কণ্ঠেই দাবী করিতে পরাঙ্মুখ নয়। কামালের কণ্ঠে নবীন তুর্কের সিংহ-গর্জ্জন পশ্চাত্যের প্রাণে বিভীষিকা সঞ্চার করে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা স্যালোনিকায় জন্মগ্রহণ করেন। মুস্তাফা নাম তাঁহার শিক্ষাগুরু কামালেরই

প্রদত্ত। কামাল শিশুবয়সেই বীরোচিত গুণগ্রামে আকৃষ্ট ছিল। সকলের অজ্ঞাতসারেই বালক কামাল উচ্চ সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কনষ্ট্যান্টিনোপলে উচ্চ সামরিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তিনি দেশের রাজনীতিক প্রসঙ্গ লইয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে নবযুগের ভাব ও চিন্তাধারার সহিত তিনি গোপনে গোপনে পরিচিত হইয়া উঠিলেন। কেন না, এই সকল পুস্তক রাজাদেশে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। তা'ছাড়া শিক্ষায়, সমাজে, রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে স্বেচ্ছাচার-তন্ত্রের প্রকাশ নানামূর্ত্তিতে দিন দিন ফুটন্ত হইয়া কামালকে সেই অত্যাচারের প্রতিকারে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল। তিনি সহপাঠিগণের সহিত মিলিয়া এক রাষ্ট্র-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সমিতিই ভবিষ্যতে নব্য তুর্কের জাতীয় দলের বীজ-কেন্দ্র—পূর্ব্বোক্ত "ঐক্য ও উন্নতি সঙ্ঘ" নামে সুপরিচিত হয়। তুর্কের নবোত্থানের ইতিহাসে এই সমিতির নাম চিরপ্রসিদ্ধ রহিবে।

কামালকে দেশের কাজে আত্মদান করিয়া স্বভাবতঃ বার বার কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। কোন দিন তিনি আপোষে সম্মত হইয়া স্বীয় মহা-নীতির অবমাননা করেন নাই। কারা-প্রাচীরের অন্তরালে একখানি তুরস্কের মানচিত্র লইয়া যখন তিনি গভীর ধ্যানে দেশের চিন্তায় ডুবিয়া যাইতেন, কে জানিত তখন এইরূপেই তিনি তুর্কের আকৃতি প্রকৃতির সহিত নিবিড় নিখুঁত ভাবে পরিচয়

গ্রহণ করিয়া আপনাকেই ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছিলেন—

"এমনি কেটেছে দ্বাদশ বরষ
আরও কত দিন হবে⋯"

—জন্মভূমির ধ্যানমূর্ত্তি এই পাগল সাধককে এমনই করিয়া সেই লৌহবেষ্টিত কারাজীবনের মধ্যে দিনে রাতে প্রমত্ত করিয়া রাখিত—তাঁহার নিজের মুক্তি-বন্ধন জ্ঞান বুঝি ছিল না। যখন দেশব্রতে সিদ্ধ হইয়া তিনি একদিন মুক্ত আলোকে বাহির হইলেন, তখন দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা তাঁর নিকট অবিদিত ছিল না। তাই দারুণ রণসঙ্কটে তিনি অগণ্য সৈন্যচালনা করিয়া তুর্কের জয়চ্ছত্র অবহেলে উড়াইতে পারিয়াছিলেন। দেশের চরম দুদ্দিনে অসংখ্য বিপদ্ ও বাধাসমুদ্র মন্থন করিয়া তিনিই মুক্তি-যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ সেনাপতিপদে নির্ব্বাচিত হইলেন।

মুস্তাফা কামাল এঙ্গোরায় নব প্রজাতন্ত্র রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন। গণশক্তির প্রতিভূ-রূপেই তিনি রাজ্যশাসন, সেনাদল, পররাষ্ট্র প্রভৃতি সকল বিষয়েই পরিচালনাভার জাতীয় মহাসভার হস্তে ন্যস্ত করিয়া, তুর্কের মাথা হইতে তিনি খেলাফতের গুরুভার নামাইয়া দিয়াছেন। ধর্ম্মের বিরাট্ প্রতিষ্ঠান রসহীন তরুর ন্যায় যেখানে নিঃসার রসশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহার ব্যর্থ গরিমা শুধু বাহিরের আড়ম্বর সৃষ্টি করিয়া মানুষকে মুগ্ধ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে, জাতীয় অভ্যুত্থানের পরিপন্থী এত বড় বিরুদ্ধ শক্তি আর নাই। কামাল এশিয়ার

ধর্ম্মবীর্য্যকে এই বিড়ম্বনার দায় হইতে মুক্তি দিয়াছেন। জাতির মুক্ত আত্মা নূতন শিক্ষায় সাধনায় সত্যই যদি এমন কিছু সত্য পাইয়া থাকে, যাহা জাতীয় জীবনের পক্ষে অমৃত, সেই অমৃতের আস্বাদই ধর্ম্মের সনাতন রূপটী আবার জাতীয় হৃদয়ে ফুটাইয়া তুলিবে, সে রূপ হইবে বিশুদ্ধ, ঋতময়, আড়ম্বরবর্জ্জিত—প্রাচ্যের সেই অমৃতই আবার জগৎকে নবজীবন দিতে পারিবে। আর তুর্ক যদি আপাত-মুক্তির সম্মোহনে বিমুগ্ধ হইয়া স্বধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়ে, ইউরোপের দানের সঙ্গে ইউরোপের প্রাণকেও নিজের ভিতর আবাহন করিতে চায়, সে পরধর্ম্মের বোঝা খলিফতের বোঝার চেয়ে অধিকতর দুঃসহ হইয়া মরণেরই কারণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কামালের সাধনা এই অধ্যাত্ম অপমৃত্যু হইতে তুর্কজাতিকে রক্ষা করুক, তবেই প্রাচ্যের গৌরববৃদ্ধি হইবে, ধর্ম্মের প্রকৃত মর্য্যাদা ও আদর জাতীয় জীবনে যথার্থ ভাবে পরিলক্ষিত হইবে।

কামালের বিধানে তুর্কের নারী আজ অবরোধমুক্তা। তারা শিক্ষায়, কর্ম্মক্ষেত্রে, সর্ব্বত্রই পুরুষের সহিত সমান সুযোগ ও দায়িত্ব লাভ করিতে অধিকারিণী। তুর্কের বিদ্যালয়ে অবাধে মহিলা-ছাত্রীগ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে; সাধারণ শিক্ষায়, স্থাপত্য-বিদ্যায়, আইন-ব্যবসায়ে, চিকিৎসাশাস্ত্রে, সর্ব্বক্ষেত্রেই পুরুষের সহিত নারী প্রতিযোগিতা করিবার অধিকার পাইয়াছে। ইহাতে তুর্কের সমাজ-জীবনে স্বাস্থ্যেরই সঞ্চার হইয়াছে, আশা করা যায়। পুরুষের সহিত অবাধ মিলনের সহস্র সুযোগের মধ্যেও উভয়ে যদি চরিত্রের দৃঢ়ভিত্তি ও অটুট সংযমরক্ষায়

উদাসীন না হয়, তাহা হইলে প্রাচ্যের নারী-গৌরব অবরোধ হইতে মুক্ত হইয়াও শ্লীলতাবর্জ্জিত হইবে না, স্বাধীনতার অমৃতময় আস্বাদে পুরুষ নারী উভয়েই জাতির জীবনবেদী চির পবিত্র ও অটল করিয়া তুলিবে।

তুর্কের নারী-স্বাধীনতা কামালকে আইনতঃ সিদ্ধ করিতেও হইয়াছে। পর্দ্দার আড়ালে পাপের প্রশ্রয় স্বাভাবিক, তাহা ভুক্তভোগী জাতির অবিদিত নাই; তাই কামাল আইন করিয়াছেন—নারী যদি আবরণ রক্ষা করে, তবে তার প্রথমে অর্থদণ্ড হইবে; দ্বিতীয় বার অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে; তৃতীয় বার রাজবিধি অমান্য করিলে প্রাণদণ্ড হইবে। জাতীয় উন্নতির অন্তরায় বলিয়া যাহা অনুভব করিয়াছেন, গাজী মুস্তাফা কামাল তাহা কঠোর বিধি প্রণয়ন দ্বারা উন্মূলিত করিতে চাহিয়াছেন—গতানুগতিকের বিরুদ্ধে এই নির্ভীক অভিযান কতখানি আত্মবিশ্বাস ও ভবিষ্যন্নিষ্ঠার উপর নির্ভর করে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

কামালের এই নব সংস্কারে যিনি তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করিয়াছেন—তিনি একজন নারী। এই মহীয়সী তুর্ক-রমণীর নাম—হালিদা এডিং হনুম—ইনি আজ সর্ব্বজনপরিচিতা। স্তাম্বুলের আমেরিকান নারী-শিক্ষালয় হইতে ইঁান সর্ব্বপ্রথম ডিগ্রী লইয়া বাহির হন। তিনি একাধারে বিদুষী লেখিকা, শিক্ষয়িত্রী ও জাতীয় দলের অন্যতম নেত্রীস্বরূপিনী। তিনি বিদ্যালয়ে, রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণাগারে, সেনাশিবিরে, আবার সৈনিকবেশে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে সমানভাবেই সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া তুর্কীর

নারীজীবনে নূতন প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছেন, সমাজে যুগান্তর আনিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রাচ্যের ইসলাম-জগৎ আজ তুর্কের স্বাধীন মহিমা-সন্দর্শনে পুলকিত; কিন্তু যেন উদ্বেগশূন্য নহে। ভারতের মুসলমান কামালের জাতীয়তামন্ত্র-সাধনের সত্য ঋক্ আজও হয় ত মর্ম্ম দিয়া সম্যক্ অবধারণ করিতে পারে নাই; তাই এখানে মুসলমানের মুখে এখনও "প্যান-ইস্‌লামের" মোহ-বাণী নির্গত হয়। কামাল অব্যর্থ দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনে বুঝাইতেছেন—মাটির সঙ্গে দরদ মিশাইয়া জাতীয় ঐক্য ও উন্নতির বিধানে ষোল আনা আত্মদান করিলেই জাতীয়তার মন্ত্র সিদ্ধ হয়। এই জাতীয়তাই মুক্তির উৎস। সে মুক্তি রাষ্ট্রে ও সমাজ-জীবনে প্রস্ফুটিত শতদলের মত সর্ব্বত্রই সৌরভ সঞ্চার করে। ভারতের মুক্তি—এই জাতি-বীর্য্য-সৃষ্টির উপরেই নির্ভর করিতেছে। তুর্কের জাতীয়তা ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের নূতন দৃষ্টি ফুটাইবে না কি?

আফগানিস্থান

যুগ-রাজের যে রাজস্য়-যজ্ঞাশ্ব বিশ্বজয়ে আজ বাহির হইয়াছে, প্রাচ্যের প্রত্যেক রাষ্ট্রেই তাহার ক্ষুরধ্বনি সভ্যতার বুক মথিত করিয়া উত্থিত হয়। এ বিজয়াভিযান আজ রোধ করিবে কে? জাতিসত্তা। তাই জাতীয়তার গানই আজ প্রাচ্যের প্রতি দেশের মুক্তি-মন্ত্র। চীন, জাপান, পারস্য, তুর্ক, আফগানিস্থান—এই খরপ্রবাহিনী-স্রোতে পাল তুলিয়া যখন প্রবল উন্মাদনায় তরী ভাসাইল, তখন প্রতিক্ষণেই যে এমন আশঙ্কা হয় না তাহা নহে—তরী বুঝি কোন অতলে লক্ষ্যহারা হইয়া ভাসাইয়াই যায়! এসিয়া আজ জাগ্রত—কিন্তু তার মূল মহাবীর্য্যের পরিপূর্ণ সন্ধান বুঝি আজও সে পায় নাই। তাই স্বাধীনতার জয়-কণ্ঠে এই যে বীরজাতির শোভাযাত্রা আজ দেখিতে পাও, তার সবখানি মৌলিক নয়। ইহাদের আদর্শের প্রেরণা অনেকখানি অনুকরণের মোহাচ্ছন্ন; ইউরোপই অহর্নিশি আপনার সভ্যতার জয়ভেরী কাণে বাজাইতেছে—এশিয়া যেন কতক মন্ত্রমুগ্ধ। এই গভীর মূলগত সত্তার মোহভঙ্গের আয়োজন—রাষ্ট্রীয়-চেতনার পিছনে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষেই একমাত্র সম্ভব; সে পথে জগদ্গুরু ভারতেরই প্রতীক্ষায় বুঝি সারা প্রাচ্য তাই প্রতীক্ষাশীল। সুদূর অতীতের মত, তুমিও ভারত, তোমার সভ্যতার

জয়ভেরী বাজাইয়া, দেশদেশান্তরে দিগ্বিজয়ী অশ্বমেধ যজ্ঞাশ্ব ছুটাইয়া আবার কবে বিশ্বের রাজপথে বাহির হইবে—এসিয়া যে তোমারই মুখ চাহিয়া আছে !

একদিন "গান্ধার অবধি জলধিসীমা" হিন্দুভারত যে অখণ্ড মানচিত্র আঁকিয়াছিল, ইহা কি কবি-কল্পনা ? লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধারে, ভারত—তথা মহাভারতের ভূগোল-পরিচয়ে সত্যের জলন্ত প্রকাশ মহিমাময় সুদূরতম কল্পনাকেও ম্লান করিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ বুঝি কাল-ধর্ম্মে ভারত সঙ্কুচিত। কিন্তু ভারতের ঐতিহাসিক গরিমা, ভারতের ভৌগলিক সীমানা দূর হইতে দূরান্তরে ছুটিয়াছিল, দেশ হইতে দেশান্তরে আত্ম-বিস্তার করিয়াছিল—তাহার নিদর্শন আজ মাটী খুঁড়িয়া বাহির হয়, ভাষার, পুরাণের, চেতনার তত্ত্ব-বিশ্লেষণে বিলুপ্ত গৌরবের কলকল সাগরোচ্ছ্বাস কর্ণে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে। এ লুপ্ত মহিমার উদ্ধারেই আজ একদল সাধককে একনিষ্ঠ-চিত্তে আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে।

গান্ধার ছিল—এই অখণ্ড মহাভারতেরই এক ক্ষুদ্র অংশ। ভারত হইতে আর্য্য-সভ্যতা যখন প্রতীচ্যবিজয়ে অগ্রসর হইয়াছে, তখন ওই সীমান্তরাজ্য অতিক্রম করিয়াই সে বাহির হইয়াছিল। হস্তিনাপুরের রাজমহিষী, সতী হিন্দু-নারীর অন্যতম আদর্শ গান্ধারী দেবী এই সীমান্ত-ভূপালেরই কন্যা। আফগানি-স্থান হিন্দুরই দেশ, হিন্দুরই প্রত্যন্ত রাজ্যখণ্ড মাত্র। হিন্দু সভ্যতার বহু স্মৃতিচিহ্ন ইহার গিরিদরীতলে অন্বেষণ করিলে আজও দুর্ল্লভ নহে। আফগানিস্থানের প্রাচীনতম ইতিহাস

আমানুল্লা ও সুরায়া

জেনারেল নাদির শা

শের আলীর পুত্র ইয়াকুব খাঁ লর্ড রবার্টের শরণাপন্ন হইলে, ইংরাজের সহিত সন্ধি স্থাপিত হয়। কিন্তু ইয়াকুব নজরবন্দী হইয়া ভারতে প্রেরিত হইলেন। ইয়াকুবের ভ্রাতা আয়ুব খাঁও ইংরাজ-মিত্র আবদার রহমানের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন ও পরে বন্দীদশায় ভারতে প্রেরিত হন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে দোস্তের পৌত্র আবদার রহমান নানা ভাগ্য বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া পরিশেষে আফগানিস্থানের আমীর হন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার পুত্র হবিউল্লা পিতৃ-রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইলেন। ইউরোপের মহাযুদ্ধে তিনি ভারতসীমান্তে শান্তি রক্ষা করায় ইংরাজের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইযাছিলেন। পরে হবিউল্লা আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে, তাঁহার ভ্রাতা নসরুল্লা খাঁ রাজ্য গ্রহণ করেন। কিন্তু সহসা হবিউল্লার তৃতীয় পুত্র আমানুল্লা পিতৃব্যের হস্ত হইতে সিংহাসন কাড়িয়া লইয়া যখন আমীর হইলেন, তখন হইতেই আফগানের ভাগ্যেতিহাস নূতন সন্ধিযুগে উপনীত হইল।

নূতন আমীর আমানুল্লা রাজা হইয়াই ভারত গবর্ণমেণ্টের দুর্গরক্ষক-রূপে যে বার্ষিক বৃত্তি প্রদত্ত হইত ও যাহার দায়ে আফগান-রাজ ইংরাজের সামন্ত-রূপেই ব্যবহার কালে গণ্য হইতেন, তাহা রোধ করিয়া দিলেন। এই ঘটনা আফগানিস্থানের "স্বাধীনতা-দিবস" বলিয়া মহোৎসব সম্পন্ন হইল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে উন্নতিশীল আমীর স্বেচ্ছায় রাজাভিজাত্য ও স্বেচ্ছাতন্ত্র বিসর্জ্জন করিয়া, প্রতিনিধি-সঙ্ঘের উপর শাসনভার অর্পণ করিলেন। তুর্ক হইতে সমরপণ্ডিত আনাইয়া, তিনি আফগান

যুবকদিগকে সমরবিদ্যায় শিক্ষিত করার ব্যবস্থা করিলেন। জাতিকে কেবল সমরকুশল করা নহে, পরন্তু সকলকে স্বদেশ-জাত দ্রব্য ব্যবহারেও বাধ্য করিলেন। দেশে নরনারী উভয়ের আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইল। নারীর অবরোধের দুয়ার খুলিল, অবগুণ্ঠন মুক্ত হইল। স্বয়ং রাণী স্বরায়া এই সংস্কারে অগ্রণী হইলেন। সারা আফগান-জাতির মধ্যে একটা নবানুপ্রেরণার উন্মাদনা-চিহ্ন বুঝি দেখা দিল। তুর্ক-আফগান সন্ধিপত্রে উৎসাহ সহকারে লিখিত হইল, "এশিয়ার জাতি-সঙ্ঘকে বন্ধনমুক্ত করার জন্য তুর্ক ও আফগান যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।" স্বাধীনতার উৎসব-সভায় নতজানু হইয়া রাজা আমানুল্লা প্রার্থনা করিলেন—"বিশ্বের মানবজাতির বুকে যে পরাধীনতার পাষাণ-ভার চাপিয়া আছে, তাহা হইতে যেন তাহারা মুক্ত হয়। আর আফগান জাতি স্বাধীনতার জন্যই যেন মৃত্যু-পণ করে।"

অতঃপর, যুগশক্তির আরও সম্যক্ পরিচয় গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হইয়া মহাসমারোহ সহকারে রাজদম্পতী ইউরোপ-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। ইতালী, ফ্রান্স প্রভৃতি স্বাধীন দেশ—বিশেষ করিয়াই ইংলণ্ড তার ঐশ্বর্য্যবিলাসের ষোড়শোপচার ভাণ্ডার খুলিয়া এই রাজদম্পতীর চক্ষু ঝলসিত করিবার জন্য অতি সমাদরে অভ্যর্থনার আয়োজন করিলেন। আমানুল্লা ইংরাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই স্বাধীন তুর্ক ও সোভিয়েট রুশিয়া দেশ ঘুরিয়া দেশে ফিরিলেন। কিন্তু নবাদর্শ-প্রমত্ত উৎসাহী তরুণ রাজার অগোচরে যে ঘোর চক্রান্ত ইতিমধ্যে তলে তলে

প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা বিস্ফোরকের ন্যায় তিনি দেশে ফিরিতেই সহসা আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিল। এই অত্যুগ্র সংস্কারের চিরবিরোধী মোল্লা-তন্ত্র ও ছদ্মবেশী শত্রুর চক্রান্ত যুগপৎ মিলিয়া আমানুল্লার রাজ্যপাট সহ সমস্ত উন্নতির আয়োজন একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ ও ভূমিসাৎ করিয়া দিল।

এই ভূমিকম্পের ন্যায় রাষ্ট্রবিপ্লবে, দস্যুসর্দ্দার বাচ্চা-ই-সাক্কো অভ্যুদিত হইয়া, আমানুল্লাকে ছলে, বলে, কৌশলে রাজ্যচ্যুত ও কাবুল অধিকার করিয়া হবিবুল্লা নামে কয়েক মাসের জন্য রাজত্ব করেন। ইউরোপের আদর্শ এত সহজে আফগানিস্থানের প্রাণ বরণ করিয়া লইল না। আদর্শবাদী আমানুল্লার প্রতিক্রিয়াই উদ্দাম নিরক্ষর বাচ্চা-ই-সাক্কো। তারপর, ধীর, স্থির, বহুদর্শী, খণ্ড-বিজয়ী, আফগানিস্থানের সেনাপতি নাদির খাঁ ইউরোপের প্রবাস হইতে ফিরিয়া, মাতৃ-ভূমির দুর্দ্দিনে একা রিক্ত হস্তে রাজ্যোদ্ধারে ব্রতী হইলেন। সমস্ত আফগানিস্থানে আজ তিনিই শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছেন। তিনিই আজ তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দের সহায়তায় আফগানিস্থানের রাজতক্তে অভিষিক্ত হইয়া, যুগ-শক্তির সহিত সামঞ্জস্য করিয়া উন্নতি ও গৌরবের পথে স্বদেশকে লইয়া চলিয়াছেন, ইহা আশারই কথা।

কোরিয়া

ভারতও পরাধীন ; কিন্তু তবুও তাহার নামান্তর ভাগ্যে ঘটে নাই—কোরিয়ার দুর্ভাগ্য, জাপান-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া তাহার প্রাচীন নামের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মানচিত্র হইতে কোরিয়া নিশ্চিহ্ন। জাপ-সম্রাট আদরের নাম দিয়াছেন—"চুজেন"। অধিকৃত রাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধিকারে আনিবার ইহা অকাট্য নীতি। নামান্তরের সঙ্গে জাতির ভাবান্তর সাধিত হইলে, শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তাহা চিরদিনের জন্য দূর হয়। কোরিয়ার নামান্তর করা যত সহজ হইয়াছে, জাতির ভাবান্তর আনা তত অনায়াস-সাধ্য নহে, এইজন্য কোরিয়ায় আজিও অশান্তির আগুন থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিয়া উঠে। বিজয়ী জাপ কোরিয়াবাসীর এই চাঞ্চল্য অকারণ বোধ করিয়াই নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে কোরিয়ার শাসন-শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষা করেন। কোরিয়ার মর্ম্মকাহিনী বড় করুণ, ভারতের ভাগ্যলিপির সহিত ইহার অনেকখানি মিল আছে।

জাপান উপসাগরের কূলে সাম্রাজ্যলোভী রুশ-সম্রাট্ রাজ্য বিস্তার করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন নাই ; তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে রুশের রণ-তরী ভাসাইয়া এশিয়ায় জয়চ্ছত্র উড়াইবার আকাঙ্ক্ষায় ভ্লাডিভষ্টকে রণভেরী বাজাইয়া উদীয়মান জাপানকে

সন্ত্রস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্যেন-দৃষ্টি ছিল এই ক্ষুদ্র কোরিয়া-রাজ্যের উপর। জাপান সেদিন সর্ব্বস্ব পণ করিয়া রুশকে পোর্টআর্থার বন্দর হইতে বিমুখ করিয়া দেয়; সে-যাত্রা কোরিয়া জাপানের স্বার্থ-রক্ষার দায়েই বাঁচিয়া যায়। ইহা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের কথা। জয়লক্ষ্মী জাপানের ললাটে গরিমার টীকা পরাইয়া তাহাকে রুশের চেয়েও অধিক লুব্ধ করিয়া তুলিলেন। পোর্টআর্থার জয় করিয়া জাপ-শক্তি পূর্ব্বাবস্থায় পরিতুষ্ট রহিল না, ক্ষুদ্র কোরিয়ার স্বার্থরক্ষার দায় বহিতে বহিতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাহা অবাধে স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লইল। দুই কোটী কোরিয়ার অধিবাসী প্রতিবাদের কণ্ঠে আকাশে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলিল। দুর্ব্বলের রোদন কাহারও কর্ণগোচর হইল না; তাহারা বুকের রক্ত ঢালিয়াও প্রতিকার পাইল না। এক্ষণে দাসত্বের শীলমোহরে তাহাদের অঙ্গ ঢাকা পড়িয়াছে; কিছু দিন পরে কোরিয়াবাসী বলিয়া জগতে কোন বস্তু থাকিবে কি না সন্দেহ—ভবিষ্যতে জাপরাজ্যভুক্ত "চুজেন" নামেই তাহারা আত্মপরিচয় দিবে।

কোরিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে স্বাধীনভাবেই চলিয়া আসিয়াছে। চীনের সাম্রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে কোরিয়াকে সন্ত্রস্ত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু কোরিয়ার অধিবাসিবৃন্দ চীনের সহিত সমজাতি ও সমধর্ম্মী বলিয়া ইহাতে তাহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। চীনের সম্রাট্‌কে যৎসামান্য শিরোপা দিয়াই সে স্বাধীন থাকিয়া গিয়াছে। চারি হাজার বৎসরের ইতিহাস তাহার প্রাচীন শিক্ষা, সভ্যতা ও জাতীয়তার অসংখ্য গর্ব্ব-চিহ্ন বুকে আঁকিয়া কোরিয়াকে বিশ্বে বিশেষ স্থান দিয়াছে। আজ

কোরিয়ার এই স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য লুপ্তপ্রায়; তাই কোরিয়াবাসীর দুঃখের মনোক্ষোভের অবধি নাই। বড় আশায় ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে জাপ-চীনার যুদ্ধান্তে কোরিয়া উভয় জাতির মধ্য-ক্ষেত্র-রূপে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়া স্বজাতির উন্নতি ও উৎকর্ষসাধনে উদ্যোগী হইয়াছিল; কিন্তু ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জাপানের শাসনদণ্ড তাহার মেরুদণ্ড চিরদিনের জন্য চূর্ণ করিয়াছে। জাতি চেষ্টা করিয়া আর এই পরাক্রম-দর্পিত জাপের লৌহশৃঙ্খল টুটাইয়া মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না; অঘটন-ঘটনপটীয়সী বিধাতৃশক্তি যদি অনুকূল হয়, তবেই কোরিয়ার ভাগ্যসূর্য্যের পুনরভ্যুদয় হইবে।

কোরিয়ার প্রাচীন সভ্যতা এশিয়া মহাদেশের গর্ব্বের বস্তু ছিল; ভারতের শিক্ষা সভ্যতার নিদর্শন তাহারা বহু শতাব্দী ধরিয়া বুকে করিয়া রহিয়াছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম-পুস্তক সমগ্র "ত্রিপিটক" কোরিয়ান ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। দক্ষিণ কোরিয়ার হেন্‌সা (Hainsa) নামক স্থানে এখনও কোরিয়ার সংগৃহীত প্রায় ৮৬,৭০০ পুস্তক সংরক্ষিত আছে। সমগ্র পৃথিবীতে এইরূপ বহুমূল্য গ্রন্থের একত্র সমাবেশ দৃষ্টিগোচর হয় না।

বিংশ শতাব্দীর আরম্ভকাল হইতেই কোরিয়া জাতীয় উন্নতিকল্পে অসাধারণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল, যুগোপযোগী শক্তি ও জ্ঞানগরিমায় নিজেদের প্রবৃদ্ধ করার আয়োজন করিয়াছিল; কিন্তু রুশশক্তিকে পরাজিত করিয়া জয়দর্পে জাপান কোরিয়ার সর্ব্বনাশ-সাধনে ইতস্ততঃ করিল না। কোরিয়ায় যে

সকল শিক্ষা-সাধনার কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, জাপান তাহা নিঃসঙ্কোচে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। কোরিয়ার বিদ্যালয়ে জাতীয় ভাষার পরিবর্ত্তে জাপানের ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। কোরিয়ার প্রাচীন কাহিনী, অতীত ইতিহাস ছেলেদের পাঠ করান বন্ধ হইয়াছে ; ইহার পরিবর্ত্তে জাপানের ভূগোল, ইতিহাস, জাপানের কীর্ত্তি-গর্ব্বের কথাই কোরিয়ার উদীয়মান জাতিকে শিক্ষা দেওয়া হয়। মহামারীর অপেক্ষা রাজ্যলিপ্সার আতঙ্ক কি ভয়ঙ্কর! মৃত্যু অসংখ্য লোকের প্রাণ হরণ করে; কিন্তু পররাজ্যলোলুপতা জাতির অস্তিত্ব মুছিয়া দিতে চায়—কোরিয়ার দুঃখের কথা শুনিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না।

জাপান কোরিয়ার শিক্ষাদানের যে নূতন ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহাও এত অপ্রচুর, যে কোরিয়াব ছেলেরা ইচ্ছা করিলেও, শিক্ষালাভের অবসর পায় না। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জাপান-প্রবর্ত্তিত বিদ্যালয়ে মাত্র ৪,১৩,৫৭৫ জন ছাত্র সঙ্কুলান হইত; ইহা অধিবাসী সংখ্যার অনুপাতে শতকরা দুইজনও নহে ; কিন্তু সেই স্থানে জাপানী শতকরা ১৮ জনের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পররাষ্ট্রহারার জীবন যে চিরান্ধকারময় হই'ব, তাহা নূতন কথা নহে।

স্বার্থ মানুষকে অন্ধ করে। কোরিয়াকে রাজ্যচ্যুত করিয়াই বৈদেশিক রাষ্ট্রশক্তি নিশ্চিন্ত থাকে নাই। জাপানের শ্রীবৃদ্ধির জন্য কোরিয়ার রক্তশোষণেও তাহাদের বাধে নাই—কোরিয়ার রাজস্ব হইতে শিক্ষাদানের জন্য ১৪০,৩৯,৪৮৬ ইয়েন ব্যয়িত হইয়াছে ; ইহার মধ্য হইতে জাপানী ছাত্রদের জন্য ব্যয় করা

হইয়াছে ৫৭,৫৩,১১১ ইয়েন। কোরিয়ায় জাপানীর সংখ্যা শতকরা ২'৩ জন, এই হিসাবে শতকরা ৩৩ ইয়েন জাপান নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য খরচ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই অর্থের একটী কড়িও খাস জাপান হইতে আনীত হয় নাই।

ভারতের ন্যায় কোরিয়াও কৃষিপ্রধান দেশ। শতকরা ৮০ জন লোক কৃষিজীবী; কিন্তু জাপানের ব্যবসায়ীরা কোরিয়ায় শস্যোৎপাদনকার্য্যে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। ইহার ফলে, কোরিয়ার শস্যসম্পদ্ জাপ ব্যবসায়ীদেরই হস্তগত হইতেছে। জাপান হইতে শ্রমজীবির আগমনে কোরিয়ায় শ্রমিকদের ভিটা ছাড়িয়া পলাইতে হইতেছে। কেবল কৃষিসমাজ লইয়াই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয় নাই, বাণিজ্য-ক্ষেত্রেও কোরিয়া রাষ্ট্র-শক্তিহীন হওয়ায় ক্রমেই পিছাইয়া দাঁড়াইতেছে। রাজ্যলাভের সঙ্গে কোরিয়ার ঐশ্বর্য্য জাপের হস্তগত হইতেছে। কোরিযার দুর্ভাগ্য বর্ণনাতীত!

নিম্নলিখিত হিসাব দেখিলেই শ্রমশিল্পে ও বাণিজ্যক্ষেত্রে কোরিয়ার বর্ত্তমান অবস্থা বুঝা যাইবে :—

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জাপানী ব্যবসায়ী ১৪৯,৭৪০,০০০ ইয়েন ব্যবসায়ে নিয়োগ করিয়াছিল, শ্রমশিল্পে জাপানী শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ৪৮,৯০৪; কোরিয়া অসংখ্য আইনের বেড়াজাল ভেদ করিয়া ও নিজেদের দুরবস্থার মধ্যে আত্মরক্ষার দায়েই এই স্থলে ১০, ১৭৪,০০০ ইয়েন ব্যবসায়ক্ষেত্রে নিয়োগ করিয়াছে—কোরিয়ার শ্রমিক এই সব ক্ষেত্র হইতে মাত্র ১৭,৮০১ জন জীবিকোপার্জ্জনের সংস্থান করিতে পায়।

কোরিয়ায় জাপানের মূলধনে ৯৩৮টী কোম্পানী কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে—কোরিয়ান ১৩২টী কোম্পানী, অন্যান্য বৈদেশিক বণিক্ ৫৬টী। বলা বাহুল্য, কোরিয়ার বন্দর, ব্যাঙ্ক, এক্সেঞ্জ সবই জাপানী কোম্পানীর হাতে—এইজন্য বৈদেশিক কোম্পানী যে সুবিধা পায়, পরাধীন কোরিয়া তাহা হইতে বঞ্চিত হয়। এই অবস্থায় দারিদ্র্য তাহাদের নিত্য সহচর হইবে—তাহাতে আর সন্দেহ কি!

কোরিয়ার রাষ্ট্রক্ষেত্রও বিপৎসঙ্কুল। দেশ-নেতৃগণের দুর্দ্দশার কথা শুনিলে, শরীর শিহরিয়া উঠে। মানুষের রক্ত মাংস এত নির্য্যাতন বরণ করিয়া দাসত্বের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া রাখিবে কত দিন?

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জাপান পোর্টআর্থার জয় করিয়াই কোরিয়ার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দেই কোরিয়ার সামরিক সৈন্য নিরর্থক বলিয়া তাহা অপসারিত করিয়া দেওয়া হয়; জাপানের বিজয়ী সৈন্য কোরিয়ায় ছাউনী করিয়া দেশের শান্তি-রক্ষায় যথেষ্ট—ইহাই ছিল তখনকার যুক্তি। তারপর অশান্তি সৃষ্টি করার যে সকল জননেতা ছিলেন, তাঁহাদের বন্দী করার ব্যবস্থা হয়। ১২০ জন প্রতিভাশালী লোক অকারণে জাপশক্তির ইঙ্গিতে কারাবন্দী হন। কোরিয়ার হিতৈষী সংবাদপত্রগুলির মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তারপর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কোরিয়াকে জাপ-রাজ্যভুক্ত করিয়া, দেশের হৃদয়ে সান্ত্বনা দিতে, একে একে নেতৃগণকে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়। অনেকেই কারাগৃহে ভবলীলা সাঙ্গ করেন; অবশিষ্ট যাঁহারা

ছিলেন, তাঁহাদের চিরদিনের মত স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে কারাগৃহের বাহিরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এ যে কি নিষ্ঠুর নীতি—ভারতীয় ধাতু যাহাদের, তাহাদের বুদ্ধির অগম্য।

তারপর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের কথা—ইউরোপের মহাসংগ্রাম শেষ হইলে ভারসেইসে যে শক্তি-সংসদের অধিবেশন হয়, যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপতি সেই সময়ে জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যকে স্বায়ত্তশাসন দিবার আদর্শ প্রচার করেন। পাছে ভারসেইসে, রাজ-অতিথি কোরিয়ার ভূপতি নিজ রাজ্যের স্বাধীনতার দাবী জ্ঞাপন করেন, এই আতঙ্কে তাঁহাকে বিষ পান করাইয়া হত্যা করা হয়। এই নৃশংস অত্যাচারে সদ্য অপহৃত-রাজ্য কোরিয়াবাসী যে উন্মত্ত হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? তাহারা কোরিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া এক নূতন রাষ্ট্র-চক্র গড়িয়া বসে। শক্তি-সঙ্ঘ কোরিয়ার এই ন্যায্য দাবী কি কর্ণপাত করিল?

কোরিয়ার বিশ লক্ষ লোকে এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে মাথা তুলিয়াছিল। রিক্ত হস্তে অন্তরের দাবী জানাইয়া কে কোথায় পশুবলদৃপ্ত রাজ্যলোভী লোকের সহানুভূতি পায়? জাপশক্তির অগ্নিনালিকা মৃত্যুশেল উদ্গীর্ণ করিয়া ৭৫০৯ জনকে এক মুহূর্ত্তে শমন-সদনে পাঠাইয়া দেয়। এই উন্মত্ত আন্দোলনে ১৫,৯৮১ জন কোরিয়াবাসী আহত হইয়া জন্মের মত বিকলাঙ্গ হইয়া যায়, আর ৪৬,৯৪৮ জনকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কারাবন্দী করা হয়—ইহার ফলে প্রায় ৫০টী ধর্ম্মমন্দির এবং কোরিয়ার ২টী প্রধান বিদ্যাচর্চ্চার ক্ষেত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

পরাভূত বিপ্লবী কোরিয়ান পলাইয়া নিষ্কৃতি পায় নাই, উত্তর কোরিয়ার ও মাঞ্চুরিয়ার উপনিবেশসমূহে প্রায় দুই লক্ষ কোরিয়ার অধিবাসী বাস করিত; জাপ গবর্ণমেণ্টের সংশয়ে, এই সকল স্থানে বিদ্রোহদমনে সশস্ত্র অভিযান প্রেরিত হয়। শুনা যায়, এই অভিযানের ফলে, ৩,১০৬ জনকে হত্যা করা হয়, ২,৫০৭ জন বন্দী, ৩১টী বিদ্যালয় ও ১০টী গির্জ্জাও অগ্নিদগ্ধ করা হইয়াছিল।

এই কঠোর শাসনদণ্ড কোরিয়ার স্বাধীনতা-কামনা চিরদিনের মত নিভাইয়া দিতে পারে নাই। যে আগুন ধু ধু করিয়া জ্বলিয়াছিল, তাহা তূষানলের ন্যায় রাষ্ট্রশক্তির তলে তলে গুমিয়া গুমিয়া জ্বলিতেছে। কোরিয়ার জীবন চির অশান্তিপূর্ণ, রাজ-সংশয়ের অবিরাম আঘাতে কোরিয়া আজ অতিষ্ঠ। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব দমিত হইলে, নূতন শাসনকর্ত্তা স্যাণ্টো যখন কোরিয়ার রাজধানীতে প্রবেশ করেন, তখন একজন ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধ কোরিয়াবাসী তাঁহার প্রাণনাশের জন্য গুলি ছুঁড়িয়াছিল। কোরিয়ার স্বাধীনতাকামীদের কর্ম্মক্ষেত্র প্রতিপদে বিপৎসঙ্কুল বুঝিয়া তাহারা সাংহাই'এ আসিয়া কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে জাপানের যুদ্ধ-সচিব স্যাংহাইএ আসিলে দুই জন কোরিয়ান যুবকের গুলিতে তিনি নিহত হন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জাপানে ভূমিকম্প হয়। এই সুযোগে, জাপানের সমাজতন্ত্র-বাদীরা জাপানের শাসনযন্ত্র হস্তগত করার চেষ্টা করে। তাহারা ব্যর্থ হইলে, এই অপরাধের ভার কোরিয়া-বাসীর উপর আসিয়া পড়ে। জাপান হিংস্রজন্তুর ন্যায় নিরপরাধ

বহু কোরিয়ানের জীবন নষ্ট করে, প্রায় ৫,০০০ হাজার কোরিয়ানকে নৃসংশভাবে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করা হয়।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে জাপ-সম্রাট্‌কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র বাহির হওয়ায়, কোরিয়াবাসীকেই অকথ্য নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ গতায়ুঃ হইলে, কোরিয়াবাসীর মনে স্বাধীনতা অপহৃত হওয়ার ব্যথা কি ভাবে জাগিয়া উঠে, তাহা সম্রাটের কবর দেওয়ার ক্ষেত্রে ফেসিষ্টদলের সহকারী সভাপতিকে কোরিয়ার শাসনকর্ত্ত-ভ্রমে হত্যা কবার ঘটনায় প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সে দিন হংকিউ পার্কে জাপানের সেনা-নিবাসে সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে যে সম্মিলনের আয়োজন হইয়াছিল, তাহাতে দুঃসাহসিক কোরিয়ান যুবক কর্ত্তৃক চিহ্নিত জাপ-নায়কগণের হত্যাকাণ্ডে এই মর্ম্মান্তিক বেদনার নিদারুণ অভিব্যক্তিই পুনরায় দেখা গিয়াছিল।

জাপান কোরিয়াকে কুক্ষিগত করার যতই কঠোর বিধান প্রবর্ত্তন করিতেছে, কোরিয়ার চিত্ত ততই বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছে। জানি না—মানুষ তার রাষ্ট্রশাসননীতির উপর আঁস্থা রাখিয়া কতদিন পররাজ্য-সম্ভোগের দুরাশা পোষণ করিবে? কোরিয়া চীনের মিত্ররাজ্য-রূপে দীর্ঘদীন যে শান্তি ও উভয়ের মধ্যে প্রীতি রাখিয়া চলিয়াছিল, জাপানের সহিত কোরিয়ার সে সম্পর্ক সংস্থাপন করা কি অসম্ভব! কিন্তু ভোগপ্রবৃত্তি মনুষ্যত্বের সীমা যেখানে উল্লঙ্ঘন করে, সেখানে যুক্তি নাই; অন্যায়,

অবিচার, অত্যাচার ন্যায়ের আসন জোর করিয়া কাড়িয়া লয়, লুব্ধ মানুষ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই বলিয়া সেখানে যায়, স্বার্থে বাজে না, তাই নীরব থাকে---কিন্তু বিধাতার বজ্র কতদিন সংহৃত থাকিবে! পশুকে চিরবন্দী রাখা অসম্ভব নয়, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কি প্রতিপাদিত হইবে না?

শ্যাম

জাগ্রত এশিয়ায় আবার আর এক তরুণ পূজারী বন্দনার অর্ঘ্য লইয়া স্বাধীন গণ-দেবতার বেদীতলে উপনীত হইল—সে নবোদিত শ্যাম। ভারত-বংশজ নৃপতি চম্প কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সুদূর প্রাচ্যের এই হিন্দু উপনিবেশ আর্য্য-সাহিত্যে "চম্পা" নামে সুপরিচিত ছিল। চম্পা হইতে চ্যাম্, যাহার অপভ্রংশশ্যাম—প্রাচীন চম্পার ইহাই বর্ত্তমান নাম। যযাতি-পুত্র অনুর বংশধর বলি তাঁহার যে পঞ্চ পুত্রের মধ্যে উত্তরাধিকার-সূত্রে তাঁহার বিরাট্ সাম্রাজ্য বিভক্ত করিয়া দেন, সেই পঞ্চ রাজ-কুমারের নামানুসারেই এই পঞ্চ রাষ্ট্রমণ্ডল যথাক্রমে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এই বিশিষ্ট অভিধান প্রাপ্ত হয়। ইহাদের সাধারণ নাম পাওয়া যায় পঞ্চ অঙ্গ বা পঞ্চাঙ্গ। অঙ্গম্ হইতেই অন্নম্—আনাম—চীনের ইতিহাসে ইহার নাম লেখা হয় ফুনান,—অর্থাৎ পুনাঙ্গ বা পূর্ব্বাঙ্গ। এই অঙ্গেরই প্রথম রাজধানী—চম্পা। পরবর্ত্তী কালে রাজধানীর নাম হইতে অঙ্গ-রাজের সমস্ত রাজ্যেরই নাম হয়—চম্পা। মালয় উপদ্বীপ শ্যাম দেশেরই অংশ। মালয় ও আনাম সহ শ্যামদেশ প্রথমে 'অঙ্গ' এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল, পরে উহা অঙ্গ প্রভৃতি পঞ্চ দেশের কেন্দ্র-স্থানীয় বলিয়া উহারও পঞ্চাঙ্গ এই নামকরণ হয়। সেই নাম পেনাঙ্গ, পাজঙ্গ, পাহং

একদিকে ফরাসীগণ যখন দক্ষিণ কোচীন, চায়না, আনাম ও টংকিঙ এবং অন্যদিকে ইংরাজশক্তি উত্তর ও দক্ষিণ ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়া জাঁকিয়া বসিলেন, শ্যামের পক্ষে তাহা শাপে বর হইল, কেন না, ইহাতে তাহার চিরদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী, কাম্বোডিয়া, পেগু ও ব্রহ্মের আক্রমণ-ভয় দূর হইল। পরে ফরাসীদের সহিত শ্যামের রাজ্যের সীমান্ত লইয়া যে বিবাদ বাধিয়াছিল, সে বিরোধের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল—শ্যামের এই পরাজয়ে। ফ্রান্সের অভীপ্সিত সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর দিয়া শ্যামরাজ মেকং নদীর পূর্ব্বপ্রান্তের সমস্ত ভূখণ্ড ফরাসীদের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে, সুদূর-প্রাচ্য সংক্রান্ত উভয়গত সমস্যার সমাধান করিতে ইংরাজ ও ফরাসীতে যে সন্ধি-বন্ধন হইল, তদনুসারে উভয় শক্তিই শ্যামের স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন। এই শান্তিপ্রদ ব্যবস্থার আনুকূল্য পাইয়া, শ্যামরাজ অতঃপর রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সংস্কার-বিধানে অখণ্ড মনোযোগ দিতে সমর্থ হইলেন। সত্যই কয়েক বৎসরের মধ্যেই রাজ্যের উন্নতি ও বাণিজ্যের প্রসারে তিনি এত দূর সফলকাম হইলেন, যে শ্যামের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। শ্যামের রাষ্ট্রতন্ত্র এইরূপে বেশ দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইল। পরস্পর বিশ্বাস নিবিড়তর হওয়ায়, ফ্রান্সও এক নূতন সন্ধি-বন্ধে কিছু অধিকার ছাড়িয়া শ্যামের ন্যায়সঙ্গত দাবী কতকটা পূর্ণ করিলেন। সেই সন্ধি বিধিবদ্ধ হইল ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে গ্রেট বৃটেনের সহিত সন্ধি করিয়া শ্যাম ইংলণ্ডকে কেডা, কেলাণ্টান, ট্রেঙ্গান্থ, পার্লিস এবং সর্ব্বোপরি

দশলক্ষ নরনারী কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ও ধনৈশ্বর্য্যপূর্ণ মালয় ষ্টেট্‌স্ নামক দক্ষিণশ্যামস্থিত রাষ্ট্র-সমুচ্চয়ের সর্ব্বসত্ত্ব বিক্রয় করিয়া বিনিময়ে খাস শ্যামের উপরে বৃটিশের কর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণ নিরাকৃত করিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

শ্যামের সিংহাসনে চক্রী-রাজবংশের রাজত্ব-কাল দেড় শতাব্দী পূর্ণ করিয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠার ৭৫ বৎসর পরেই তাঁহাদের রাজ্যে পাশ্চাত্য আলোক প্রবেশ করিয়াছিল। রাজা মঙ্কুট সর্ব্বপ্রথম এই আলোকে আকৃষ্ট হইয়া উহা স্বরাজ্যে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন—পাশ্চাত্যের সহিত এই সংস্পর্শের ফলে, শ্যাম যুগশক্তিরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিবে। তাই তিনি ইউরোপীয় জাতিবৃন্দের সহিত সন্ধি করিয়া উহাদিগকে শ্যামে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দিয়াছিলেন। এইরূপে ধীরে ধীরে শ্যামে পাশ্চাত্যপ্রভাব অনুপ্রবিষ্ট ও জাতীয় জীবনে সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ করে। তাঁহার উত্তরাধিকারী নরপতি মহারাজ চূড়ালঙ্করণের ৪২ বৎসর-ব্যাপী শাসনকালে এই প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জাতি-হৃদয়ে সংক্রামিত হয় ও ক্রমে ইহা শ্যামের জীবনে দৃঢ়মূল হইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিবার সুযোগ পায়। রাজা চূড়ালঙ্করণ রাষ্ট্র-কার্য্যের পরিচালনার জন্য পশ্চিম হইতে রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ বিশেষজ্ঞগণকে আনিয়া স্বদেশে উন্নত ধরণের শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তন করেন ও প্রায় শতাধিক বিদ্যার্থীকে ইউরোপে প্রেরণ করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্রোড় হইতে রত্নরাজি আহরণ করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থাও করিয়া যান। এই সকল নবশিক্ষিত তরুণই পশ্চিম

হইতে প্রত্যাগত হইয়া শ্যামের জীবনে ও রাষ্ট্রতন্ত্রে প্রবল-স্রোতে নূতন ভাবের ঢেউ বহাইয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান মহারাজ প্রজাধিপক ও তাঁহার আপন ভ্রাতা অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতি ৬ষ্ঠ রাম উভয়েই এই একই নীতি অকপটে অনুসরণ করিয়া শ্যামকে নবভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ইঁহাদের আন্তরিক প্রয়াসের ফলে শ্যাম আজ প্রতীচ্যের বিদ্যুচ্ছটায় সমুজ্জল অথচ সর্ব্বপ্রকারেই আপনার স্বাধীনতার সুপ্রতিষ্ঠায় প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

আজ শ্যামের মন্দিরে মন্দিরে আর শান্ত পুরোহিত ভগবান তথাগতের তেমন করিয়া জয় বন্দনা করে না; সেখানে বুঝি পাশ্চাত্যের তুরী, ভেরী, ঢক্কা নিনাদিত হইয়া কর্ণপটহ বিদীর্ণ করিয়া তুলে। আজ শ্যামের শান্তি-শীতল সুখ-নীড়ে যন্ত্রযুগের বিকট কোলাহল প্রবেশ করিয়া তাহার প্রাচ্য-প্রাণের ধ্যান-মৌন সমাধি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। প্রাচ্যের অন্যান্য সকল জাতির ন্যায় শ্যামেরও অন্তর বাহির উভয়ই আজ নব জাগরণের সমারোহে চঞ্চল, অধীর, অশান্ত। শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্কক নগরীর পাশ্চাত্য শোভা-সৌষ্ঠব দেখিলেও, এই কথাই অন্তরে স্পষ্ট করিয়া আঁকিয়া উঠে। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণিত চিত্র হইতে সেই বিবরণটুকুই এখানে সঙ্কলন করিয়া দিতেছি—

"রাজা চূড়ালঙ্করণের সময়েই রাজনগরী ব্যাঙ্কক পাশ্চাত্য ভাব-গরিমা-সমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হয়। আজ অতীতের প্রাচ্য সহরটী তলাইয়া গিয়া একেবারে পাশ্চাত্য নগরী-রূপে যেন নব জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সহরের বুক চিরিয়া

বৈদ্যুতিক ট্রাম ছুটিয়া চলিয়াছে। বিদ্যুতের আলো, বিদ্যুতের পাখা—বিলাসের সকল উপকরণ আজ সেখানে সহজ-লভ্য। মহারাজ স্বয়ং এই নবীন ভাবধারার ভক্ত পূজারী রূপে রোমক স্থপতি-বিদ্যার অনুকরণে তাঁহার সূর্য্যপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতীচ্যের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন এবং অন্যান্য রাজকীয় বিভাগসমূহের হর্ম্ম্যরাজিও পাশ্চাত্য স্থাপত্য-বিদ্যা-বিশারদগণ দ্বারা পরিকল্পিত ও সুনির্ম্মিত হইয়াছে। ব্যাঙ্কক নদীতটে শ্বেত সদাগরের বিরাট্ অট্টালিকাসমূহ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে—সারা নগরীটীকে তাহা নাকি অপরূপ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

অপরূপই বটে!

ব্যাঙ্ককে জলের কল স্থাপিত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, উহাতে কলেরা ও সান্নিপাতিক বিকারের ভয় বিদূরিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে এখানে শুষ্ক ঋতুতে ঐ রোগ ভীষণ মহামারী রূপে আবির্ভূত হইত। ব্যাঙ্কক নগরীর রাজপথসমূহ আধুনিক যান-বাহন চলার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে।"

কিন্তু এই নবাগত আধুনিকতার স্রোতঃ শ্যামের সর্ব্বশ্রেণীকে অনুপ্রাণিত করিতে পারে নাই। শ্যামের ৯,৮৩১,০০০, অধি-বাসীর মধ্যে বর্ত্তমানে খাঁটি শ্যাম-জাতীয় ৩,৮০০,০০০ তাহারই প্রায় সমসংখ্যক অর্থাৎ ৩,৬৫০,০০০ লাও জাতীয়, প্রায় ৫,০০,০০০ চৈনিক, ৪০০,০০০ মালয় ও তাহা ছাড়া বাকী কাম্বোডিয়া, ব্রহ্ম-দেশ, ভারতবর্ষ, মোন, কারেণ, আনাম, কাচে, লাওয়া প্রভৃতি দেশের লোক আছে। ইহাদের মধ্যে চীন ও ভারতীয় প্রভৃতি

আধুনিকতার পক্ষপাতী নহে। শ্যামের পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞগণ যতই আধুনিকতার দিকে দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন, কিন্তু বৌদ্ধমন্দির, চীনের প্যাগোডা যেন অক্ষয় অম্লান হইয়াই আত্ম-মহিমায় বিরাজ করিতেছে। বৌদ্ধমন্দিরের উচ্চ চূড়ায় প্রাচীন ভারতেরই বিজয়পতাকা সগর্ব্বে উড়িতেছে; আর প্যাগোডার পরিকল্পনায় নির্ম্মিত চৈনিক গৃহগুলি প্রাচীন চীনসভ্যতার নিদর্শনরূপে আধুনিক সকল প্রকার বিলাসবিপণির আশে পাশেই মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রাচীর এই দৃঢ়-মূল বৈশিষ্ট্য কি নূতনের বন্যাস্রোতে চিরদিন আত্মরক্ষা করিতে পারিবে?

শ্যামের প্রাথমিক শিক্ষানীতি চিরদিন বৌদ্ধ পুরোহিত সঙ্ঘের হস্তেই পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে পুরোহিত ও সাধারণ উভয়েরই জন্য অধ্যাপনা-কার্য্যে সুশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হওয়ায়, এই ধর্ম্মসাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়গুলি সরকারী শিক্ষানীতির অনুগত হইয়া উঠিতেছে। সামরিক নৌবিভাগীয় আইনবিদ্যা ও শাস্ত্রীশিক্ষার বিদ্যালয়গুলি ছাড়া সমুদয় শিক্ষায়তনই আজ শিক্ষাসচিবের হাতে। শ্যামে সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৪৩টী, ইহাতে ছাত্রছাত্রী ৪৭,২৬৮ জন ও অধ্যাপকের সংখ্যা প্রায় ২০০০ হাজার। সরকারী বিদ্যালয়ে সংযুক্ত শিল্পায়তন খোলা হইয়াছে ৬৫টী, তাহাতে ছাত্র-সংখ্যা ১,১০০ জন—ইহাদের অধিকাংশই শিক্ষক হওয়ার জন্যই শিক্ষা লাভ করিতেছে। বিভাগীয় পরিদর্শকের তত্ত্ববধানে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক ৫,৭০৭টী পল্লী বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে, তাহার ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা ৫২৭,৬০৩ জন এবং শিক্ষকের সংখ্যা ৯,৮৭২—

ইহা ছাড়া বেসরকারী বিদ্যালয় আছে ৫৭৩টী, ইহার ছাত্র-সংখ্যা ২৭,৪৩৫ ও অধ্যাপক ১,৪৪৬ জন। অনেক বিশেষ বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষায় অধিকাংশ শিক্ষাদান করা হইতেছে—তন্মধ্যে তিনটীতে সম্পূর্ণ ইংরাজ শিক্ষকের অধীন সবখানি পাঠ্যধারাই ইংরাজী ভাষায় প্রদত্ত হয়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্ককে "চূড়ালঙ্করণ বিশ্ববিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে রাষ্ট্রনীতি, স্থাপত্য, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য ও বিজ্ঞান অধ্যাপনার আয়োজন করা হইয়াছে। বিশিষ্ট বিদ্যালয়সমূহে শ্রেষ্ঠ ছাত্রদিগকে উৎসাহিত ও সাহায্য করিবার জন্য বৃত্তিদানেরও ব্যবস্থা আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগ আজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া না উঠিলেও এই চলমান যন্ত্র হইতেই স্থপতি-বিদ্যাবিশারদ ও চিকিৎসক বাহির হইয়া শ্যামের এই সকল দিকে অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হইতেছেন। বৃত্তিধারী ছাত্রগণ দলে দলে প্রতি বৎসরেই ইউরোপের বিভিন্ন সভ্যদেশসমূহে দেশোন্নতিরই পিপাসা হৃদয়ে লইয়া অভিযান করিতেছেন ও উচ্চশিক্ষা লাভ পূর্ব্বক কৃতী লইয়া দেশে ফিরিতেছেন। এতদ্ব্যতীত, রাজকীয় ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চতর শিক্ষাও সুলভ হওয়ায়, অতি দরিদ্র ব্যতীত সারা শ্যাম-রাজ্যে শিক্ষামন্দিরের দুয়ার আর কাহারও পক্ষে অনুদ্ঘাটিত কিম্বা দুরধিগম্য নহে।

জগদ্ব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কটের ঢেউ শ্যামের বুকেও লাগিয়াছে। উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য অসম্ভব রূপে হ্রাস পাওয়ায়, শ্যামের এই বিপুল অগ্রগতির স্রোতঃ যেন ক্ষুদ্ধ হইয়া পড়ে। তাই মহারাজ প্রজাধিপক অর্থনৈতিক কারণেই বৈদেশিক

বিশেষজ্ঞগণকে বাধ্য হইয়াই বিদায় দিতেছিলেন। শ্যামবাসীরাও ক্রমেই বুঝিতে শিখিলেন, যে রাষ্ট্র-কার্য্য আর বিদেশীর স্কন্ধে ভর দিয়া চলিবে না, নিজেদেরই হাতে সব ভার ধীরে ধীরে তুলিয়া লইতে হইবে। শ্যামরাজেরই শিক্ষাদীক্ষায় শ্যামের প্রজাশক্তি এইরূপে পরিবর্ত্তনের খর তরঙ্গে পড়িয়া আমূল সর্ব্বব্যাপী বিপ্লবের জন্য লক্ষ্যে অলক্ষ্যে প্রস্তুত হইয়া উঠিল।

শেষে একদিন বিনা-মেঘে বজ্রপাতের মত অকস্মাৎ এই বিপ্লবের রুদ্রমূর্ত্তি শ্যামের রাষ্ট্রক্ষেত্রে ঘোর ঘন-গর্জ্জনে দেখা দিল। এক জর্ম্মণ নারী প্রথম বাহিরের জগতে এই অপূর্ব্ব সংবাদ বেতারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিপ্লবের প্রস্তুতি অতি গোপনে, সন্তর্পণে, নিগূঢ় কর্ম্মকৌশলে সুপরিচালিত হইয়াছিল; তাই মহারাজ প্রজাধিপকের ছয় বৎসর নিরঙ্কুশ সুশাসনের অন্তরালেও যে এতখানি অসন্তোষ জমিয়া জমিয়া প্রজার চিত্তে নেপথ্য-ভূমি রচনা করিয়া তুলিতেছিল, জগতের কেহই তাহা বাহির হইতে জানিতে পারে নাই। একদিন সুপ্রভাতে মহারাজ প্রজাধিপক ও শ্যামের চক্রী-রাজবংশের সহিত জগদ্বাসীও সহসা জানিল—শ্যামে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রে যবনিকা-পাতের সময় আসিয়াছে; আজ প্রজাশক্তিই প্রবল হইয়া নিয়ম-তন্ত্র শাসনবিধান স্বহস্তে গড়িয়া তুলিতে চায়। প্রথম হইতেই সৈনিক ও নাবিকমণ্ডলী এই রাষ্ট্রবিপ্লবে যোগদান করিয়া জন-সঙ্ঘের পক্ষ প্রবলতর করিয়া তুলে। সৌভাগ্যের বিষয়, প্রাচ্যচরিত্রসুলভ সুগভীর শান্তিনিষ্ঠা ও বিপ্লবনেতৃবৃন্দের অপূর্ব্ব রাষ্ট্রজ্ঞান, মন্ত্রগুপ্তি, নিগূঢ় সংহতিকৌশল এবং অসাধারণ

সংযমশক্তির ফলে এই বিপ্লবের দেবতা কতিপয় সেনানায়ক ও প্রধান সেনাপতির রুধির পান করিয়াই শান্ত হইয়াছেন—নর-শোণিতের ধারা শ্যামকে প্লাবিত করে নাই। ইহার জন্য গণনেতৃগণের ধীর, শান্ত কর্ম্মপ্রণালী, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও অনুদ্বেল বিচক্ষণতার যেমন সবিশেষ প্রশংসা করিতে হয়, তেমনি মহারাজ প্রজাধিপককেও প্রজাপক্ষের দাবীপূরণের জন্য তাঁহার শান্ত-মধুর স্বভাবসুলভ যোগ্য মনস্বিতা ও সাগ্রহ তৎপরতা প্রদর্শন করার জন্য ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। যাহা হউক, অবরুদ্ধ রাজপরিবারকে মুক্ত ও মহারাজ ব্যতীত আর সকলকেই বিদেশে প্রেরণ করিয়া এই বিপ্লবের ঝড় অল্পকালের মধ্যেই প্রশমিত হইয়াছে। শ্যামে গণশক্তি কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত নিয়মানুগ রাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। প্রাচ্যের সনাতন সংযম ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার উপর দাঁড়াইয়া, শ্যাম যদি পাশ্চাত্ত্যের জাগ্রত দান নাম-রূপের মোহ কাটাইয়া নিজ জীবনে সুকৌশলে বরণ করিয়া লইতে পারে, এশিয়ার পক্ষে সে শুভ দৃষ্টান্ত গণদেবতার জয়ের সঙ্গে এশিয়ার নিজস্ব প্রাচ্যমহিমাও অটুট ও অক্ষয় করিয়া তুলিবে—আমরা এই আশার প্রদীপ বুকে জ্বালিয়াই শ্যামের নব বিপ্লবরঙ্গের শুভাবসান কামনা করিতেছি। যুগের তালে পা ফেলিয়াই এশিয়ার শোভাযাত্রা সফল হউক—প্রাচী'র দেশে দেশে, প্রতি রাষ্ট্রে জাগরণের বিজয়-গীতি নানা সুরে ছন্দে ঝঙ্কৃত হইয়া যুগান্তরের অভেদ অদ্বিতীয় মহামানবেরই জীবন-প্রভাতের সূচনা করুক।

পরিশিষ্ট

পীতাতঙ্ক

পাশ্চাত্য সভ্যতার বুকে পীতাতঙ্কের সূচনা—১৯০০ খৃষ্টাব্দে। সেই বৎসর মহাচীনের শাংটুং প্রদেশে খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক রেভারেণ্ড জে ব্রুককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় ও ইহারই অনতিদূরে আরও দুইজন পাদ্রীও নিহত হয়। এই নৃশংসকাণ্ডের জবাবদিহির ফলে, আশ্বাসবাক্যের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু অর্থদণ্ড দেওয়া হয় ও কয়েকজনের—সম্ভবতঃ তারা নির্দোষই—ফাঁসী হইয়া যায়। শাসনকর্ত্তা যু-শিয়েন পদচ্যুত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহাকে পরক্ষণেই শাংসি প্রদেশে শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করা হয় ও সেখানে প্রায় ১১০ জন ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান তাঁহার হস্তে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হয়। ইহার মূলে ছিল একটী প্রবল বিজাতি-দ্বেষী আন্দোলন—যাহা চীনের ইতিহাসে "বক্সার আন্দোলন" নামে পরিচিত।

এই ইতিহাসের তথ্য ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরই লিখিত কাহিনী। "বক্সার" নামও পাশ্চাত্যেরই দেওয়া। চৈনিক ভাষায় উক্ত আন্দোলনের নাম—ই-হো-চুয়ান—কোথাও বা টা-টু-হুই। সমিতি বহুদিনের, উক্ত নামও কে দিয়াছিল কে জানে—কেন না, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ মাঞ্চুসম্রাট্‌ ও সেই সঙ্গে বৈদেশিক

শক্তিপুঞ্জ—যাহারা লোভাতুর হিংস্র গৃধ্রশকুনির ন্যায় মহাচীনকে ছিঁড়িয়া খাইবার চেষ্টায় ছিল—ইহাদের অত্যাচার অথবা অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম বিদ্রোহের বীজাঙ্কুর রূপেই এই সমিতির উৎপত্তি। চীনের অসংখ্য বৈপ্লবিক সমিতির ন্যায় এই সমিতিও মাঞ্চুসম্রাট্ কর্ত্তৃক রাষ্ট্রীয় বিধানে নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

"বক্সাররা" যুগপৎ রাজদ্রোহী, খৃষ্টধর্ম্মদ্রোহী, ও বিদেশীদ্রোহী বলিয়া বিদেশীয় তুলিকায় চিত্রিত। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে, যখন তাহাদের নেতা হইলেন রাজবংশীয় কুমার টুয়ান, তাঁহার প্রভাবে সাম্রাজ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধগামী ভাবস্রোতঃ কতকটা প্রত্যাহৃত হইয়া বিদেশীয় শক্তি ও সভ্যতার বিরুদ্ধেই সমস্ত রোষ ও আক্রোশ কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠে। ইহার ফলে তিন মাসের মধ্যেই উত্তর ও মধ্যচীন হইতে মিশনরী, এঞ্জিনীয়র, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, খৃষ্টীয় গির্জ্জা, স্কুল ও কলেজ সব উচ্ছিন্ন করা হয়।

ইহার তিন বৎসর পূর্ব্বে, নবভাবে উদ্বুদ্ধ সম্রাট্ কুয়াংসু মানব-সমাজের এক পঞ্চমাংশ বিরাট্ মহাজাতির অধীশ্বর হইয়া নানা দিকে খরবেগে উন্নতির প্রবাহ বহিয়া আনিতে মনস্থ করেন। তিনি চীনের রাষ্ট্রীয় পরীক্ষাপদ্ধতি সরল করিয়া দেন, রাজধানী পিকিং সহরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন, প্রদেশে প্রদেশে শিক্ষা-সমিতি গঠন করিয়া তুলিবার আদেশ করিয়াছিলেন। রাজ্যময় দ্রুতগতিতে রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি সারা আঠার প্রদেশকে তার দিয়া জালের ন্যায় ছাইয়া একত্র গাঁথিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এমন কি, তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মমন্দিরগুলিকেও

পর্য্যন্ত শিক্ষাগৃহে পরিণত করিতে আজ্ঞা দান করিয়াছিলেন। এইরূপ নানাপ্রকার সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে গিয়াই সম্রাট্ রাজমাতা মহারাজ্ঞীর কোপভাজন হইয়া তাঁহারই কৌশলে ধৃত হইলেন ও অসুস্থতাচ্ছলে বন্দীবাস-রূপ অপূর্ব্ব 'স্বাস্থ্যনিবাসে' প্রেরিত হইয়া মহারাণীকে চিরদিনের জন্য ভাবনামুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহকারী সংস্কারপ্রয়াসী সচিব ও কর্ম্মচারিগণ একে একে নিহত বা পলাতক হইলেন।

চীনের এই জবরদস্ত সম্রাজ্ঞীর নাম—শিহিতাওস্থ-কাঙি-চোহু-চাংযীও-শাকুঙ-চুইশিন-চুংশী। এই সুদীর্ঘ নামের অধিকারিণী মহারাণী মাঞ্চুবংশীয়া উচ্চশিক্ষিতা নারী—পূর্ব্বসম্রাট্ শিন-ফেঙের রক্ষিতা-রূপে প্রথমে রাজান্তঃপুরে স্থান পাইয়াছিলেন; পরে ভারতের মনোমোহিনী নূরজাহানের ন্যায় সম্রাটের উপর অশেষ মায়াজাল বিস্তার করিয়া সাম্রাজ্যে যথার্থতঃ একেশ্বরী সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই উন্নতিকামী সম্রাট্পুত্রের জীবনান্ত করিয়া, স্বয়ং রাজদণ্ড পুনর্গ্রহণ ও রাজ্যময় উন্নতিযুগের খরস্রোতঃ রুদ্ধ করিতে তিনি যৎপরোনাস্তি উদ্যোগী হইলেন। এই প্রতিক্রিয়ামূলক প্রয়াস না হইলে, চীন আজ প্রতিবেশী জাপানেরই ন্যায় জগতের হাটে সমান তেজোবীর্য্যে ও সগৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত কি না, কে জানে!

"বক্সার" আন্দোলন—একাধারে এই অত্যাচারী স্বেচ্ছাতন্ত্র ও বিদেশীয় প্রভুত্ববিস্তার-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে চীনের জাতীয়তা-প্রয়াসী চেতনার প্রথমে অগ্নিস্ফুরণ। এই বিস্ফোরণ ঘটিলে, ৩৫০ জন অফিসারের অধীনে, ইংরাজ, আমেরিকান, জর্ম্মন, রুশীয় ও

জাপানী—এই পঞ্চশক্তির একত্র মিলনে বক্সারদের হস্ত হইতে স্ব স্ব রাজদূতাবাসের উদ্ধারার্থে এক সংযুক্তবাহিনী পিকিং সহরে সরাসরি প্রেরিত হয়। সেদিন পাশ্চাত্য-সভ্যতার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারী মাঞ্চুসাম্রাজ্যতন্ত্র ও চীনের নবাঙ্কুরিত জাতীয়তা—উভয়কেই আশ্রয় করিয়া "পীতাতঙ্ক" সর্ব্বপ্রথম বিভীষিকা বিস্তার করিয়া শক্তিপুঞ্জের মনে ধূমকেতুর ন্যায় উদিত হইয়াছিল। অবশ্য সেদিনও জাপান ছিল ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের সপক্ষে—কিন্তু "বক্সার" আন্দোলনের পর হইতেই কবে চীন ও জাপান, এই দুইটী প্রাচ্যজাতি হাত ধরাধরি করিয়া শ্বেত প্রভাব ও সভ্যতার বিরুদ্ধে একটা ঘোরতর বিদ্রোহধ্বজা উত্তোলন করে, এরূপ একটা আতঙ্কের ছায়া ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য জাতিনিচয়ের মনের কোণে ঠাঁই পাইতে আরম্ভ করে। শেষে জর্ম্মন-সম্রাট্ কাইজার ২য় উইল্‌হেল্‌মই এই আতঙ্ককে পরিস্ফুট ভাষা দিয়া—"the yellow peril" বলিয়া রাষ্ট্রক্ষেত্রে ভবিষ্যতের অন্যতম সমস্যা রূপে স্থাপন করেন। সেও ইউরোপের মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেকার কথা।

সেই বক্সার-যুদ্ধ উপলক্ষে ইউরোপীয় চতুঃশক্তি জাপানের শৌর্য্যবীর্য্য ও অপূর্ব্ব রণকুশলতায় স্তম্ভিত হইয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল—

"The way these Japanese fought was a revelation. The Chinese might shoot them down by the dozen, but those left did not even waver. They were resolvod on victory all through."

পড়িয়াছে। মহাবীর সিকন্দরকে সামান্য দস্যু এই তত্ত্বকথা শুনাইবার স্পর্দ্ধা দেখাইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে কি অন্তরে লজ্জিত করিতে পারিয়াছিল? সামান্য বিশেষ লইয়া শক্তি-ভেদে নীতিভেদ—ইহাই মানবেতিহাসের নির্ম্মম শিক্ষা, বিশ্বসভ্যতার মর্ম্মবাণী।

কিন্তু জাপানের এই নবসভ্যতার গুরু কে? ইহা খুঁজিতে গেলে, ইউরোপকেই মনে পড়ে। জাপানের এই ভাব-জয় পাশ্চাত্যসভ্যতারই বিজয়লক্ষণ। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া জাপান শিখিয়াছে—সাম্রাজ্য-নীতি। রুশিয়াকে পরাজয়ের ব্রহ্মাস্ত্র হানিয়া জাপান আপনার দৃঢ়-সংহতিবদ্ধ অজেয় জাতীয়তারই পরিচয় দিয়াছে বটে; কিন্তু এই জয়শক্তির মূল্য দিয়া সে বুঝি যুগধর্ম্মই ক্রয় করিয়াছে। এই যুগনীতিই সাম্রাজ্য-বিস্তার। জাপান চায়—আত্মসাম্রাজ্যের প্রসার ও দিগ্বিজয়। এই দৃঢ়নীতি ধরিয়াই জাপান বিশ্ব-শক্তির আনুকূল্যের সুযোগ গ্রহণ ও প্রতিকূলতার বাধা অতিক্রম করিয়া, বুদ্ধিবলে ও বাহুবলে শনৈঃ শনৈঃ স্বীয় লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতেছে। রুশ-জাপান মহাসমর এই অব্যর্থনীতিরই একটা সন্ধি-পর্ব্ব। এই সন্ধি-মুহূর্ত্তে জাপানই জয়লক্ষ্মীকে টানিয়া নিজ অঙ্কলক্ষ্মী করিয়াছে। চীনের বক্সার-যুদ্ধের পর প্রাচ্যোত্থিত পীতাতঙ্কের ইহাই দ্বিতীয় আস্তরণ।

জল-তরঙ্গে যেমন ঘূর্ণাবর্ত্ত থাকে, তেমনি বিশ্বের শক্তিসমুদ্রেও ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনে কোথাও কোথাও ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি হয়। সুদূর প্রাচ্যের রাষ্ট্র-সংঘাতে বর্ত্তমানে এমনই চক্রদহ

হইয়া উঠিয়াছে—মাঞ্চুরিয়া। দেহে কোথাও ক্ষতসৃষ্টি হইলে, যেমন তাহা বিষাক্ত মক্ষিকাকুলের আকর্ষণ-কেন্দ্র হয়, তেমনি সুদূর প্রাচ্যে চীন, আবার চীনের সুদূর প্রান্ত মাঞ্চুরিয়া শক্তিপুঞ্জের লোলুপ দৃষ্টির অনুকূল লক্ষ্যস্বরূপ। রুশ, চীন ও জাপ—এই সবল দুর্ব্বল শক্তিচক্রের মধ্যে পড়িয়া মাঞ্চুরিয়া আজ প্রাচ্যের ভাগ্যনাট্যের এক অঙ্কের সহজ রঙ্গমঞ্চ হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। মাঞ্চুরিয়াকে যে চীনের গর্ভ-গৃহ স্বরূপ বলা হয়, কথাটা নিতান্ত অমূলক নহে। এই গর্ভ-গৃহ যে অধিকার করিতে পারিবে, মহাচীন ও তাহারই অনিবার্য্য ক্রমে সমগ্র সুদূর প্রাচ্য তাহারই পদানত হইবে। তাই মাঞ্চুরিয়াকে প্রভাবাধীন করিবার জন্য উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিক্ হইতে শক্তিব্যূহ শ্যেনদৃষ্টি ক্ষেপণ করিয়া বরাবর পরস্পরের পানে হানা দিয়া আসিতেছে।

মাঞ্চুরিয়ার অভিমুখে রুশিয়ার প্রথম সুস্পষ্ট অভিযান আরম্ভ হয়—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে। আইগানের সন্ধিফলে, রুশিয়া সুঙ্গারি নদীতে নৌচালনার অধিকার লাভ করে। ইহার পূর্ব্ব হইতেই রুশ এই নদীপথে অনেকবার "বৈজ্ঞানিক" অভিযান প্রেরণ করিয়াছে। রাষ্ট্রীয় দেশসংযোজনের স্বপ্ন আপনার সুদূরবর্ত্তী পরিকল্পনায় স্থান দিয়া ভবিষ্যৎ ও বিধাতার হস্তে সেই স্বপ্নের সূত্রটীকে ধরাইয়া দিবার প্রয়াসই সে এই সকল আয়োজনের মধ্য দিয়া করিয়া আসিতেছে। কল্পনা আরও স্পষ্টতর মূর্ত্তি লইল—১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে, যখন রুশীয়-চৈনিক ব্যাঙ্ক ও চীন গভর্ণমেণ্ট চুক্তিবদ্ধ হইয়া প্রাচ্য-চৈনিক রেলপথের নির্ম্মাণকার্য্য

অনুমোদিত করিল। ইহার পূর্ব্ব বৎসর জাপান লিয়াও-টং উপদ্বীপের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু রুশ, জর্ম্মনী ও ফ্রান্স—এই ত্রিশক্তি মিলিয়া তাহাকে এই অধিকার প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দেই রুশ নিজে ২৫ বৎসরের জন্য সর্ত্ত করিয়া পোর্ট আর্থার, ডাল্নী ও লিয়াও-টাং উপদ্বীপের দক্ষিণাগ্রভাগ খাজনা করিয়া লয় এবং হার্ব্বিন হইতে মুকদেন ও নূতন ইজারা-স্থান পর্য্যন্ত রেলপথ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পঞ্চশক্তির অন্যতম রুশিয়া বক্সারদের বিরুদ্ধে অভিযাত্রাচ্ছলে মাঞ্চুরিয়ায় সৈন্যপ্রেরণ করে। তারপর নানা অজুহাতে এই সৈন্যবাহিনী তুলিয়া লইতে ক্রমাগতই বিলম্ব হয় দেখিয়া জাপান, গ্রেট বৃটেন ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র একত্র মিলিয়া রাষ্ট্রনৈতিক হুমকি দেখাইয়া তাহাকে এই প্রয়াস হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করে। তাহাতে বিফল হইয়া এবং মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়া উভয়েরই আসন্নসঙ্কট দেখিয়া, জাপান ইহাতে নিজেরই প্রাণের দায় বুঝিয়া অবশেষে রুশিয়ার বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিয়া দিল। ইহাই ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের রুশ-জাপান মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধে জাপানই জয়ী হওয়ায়, রুশ প্রায় ১৭শ শতাব্দী হইতে মাঞ্চুরিয়া-মুখে অনধিকারপ্রবেশ ও প্রভাববিস্তারের যে উদ্যোগ বারম্বার করিয়া আসিতেছিল, তাহার সে উদ্যোগ ও তদন্তনিহিত স্বপ্ন অন্ততঃ কিছুকালের জন্য একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। পোর্টস্-মাউথের সন্ধিফলে, জাপান দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় রুশিয়ার অধিকৃত স্থানসমূহ, এমন কি সেই পঁচিশ-বর্ষী ইজারা ও চাংচুনের দক্ষিণবর্ত্তী রেলবর্ত্ম—সবই দখল

করিল। ক্রমে রুশিয়ার স্থানে জাপানই আজ মাঞ্চুরিয়ার কানন-শৈলে, শস্যশ্যামলা উপত্যকায় রুশিয়ার চেয়ে দৃঢ়তর ভাবে মৌরসী-সত্ব অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া বসিয়াছে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় কুরুক্ষেত্রের মহাযোগে, পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জের দৃষ্টি নিজ নিজ ঘর সামলাইতেই ব্যাপৃত থাকায়, জাপান সেই অবসরে চীনের উপর চাপ দিয়া, একপ্রকার জোর জুলুম করিয়াই দখলী-স্বত্ব ৯৯ বৎসরের জন্য বাড়াইয়া লইল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার মহাবিপ্লবে, জাপান আশা করিয়াছিল বটে---এইবার উত্তর মাঞ্চুরিয়া পর্য্যন্ত অধিকার-বিস্তারের সমধিক সুযোগ পাওয়া যাইবে; কিন্তু জারের গভর্ণমেণ্টের স্থলে সোভায়েট গভর্ণমেণ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, ভিন্ন ধারায় সেই একই রুশিয়ান নীতি লইয়া চীনের মর্ম্মস্থলে পর্য্যন্ত হানা দিতে একটুও বিলম্ব করিল না। উপরন্তু ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের চৈনিক-রুশিয়ান চুক্তি-বলে, প্রাচ্য-চৈনিক রেলপথের উপরেও রুশিয়ার অংশীদারত্ব বাহাল রহিল।

মাঞ্চুরিয়ার আদি ইতিহাসও চীনেরই সহিত বিজড়িত। শেষ মাঞ্চুরাজবংশ যুচি বা যুচেন জাতি হইতে উদ্ভূত। এই যুচেনেরা আবার সুষেণবংশীয় বলিয়াই পরিজ্ঞাত। খৃষ্টপূর্ব্ব ১১০৬ সালে ইহারা চীন-রাজসভায় একটি অপরূপ শর উপহার পাঠাইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার পর ২০০০ বৎসরের মধ্যে এই একই রক্তধারাবিশিষ্ট আর একটা মধ্যবর্ত্তী জাতির নাম অনুসন্ধিৎসুগণ খুঁজিয়া পাইয়াছেন, ইহাদিগকে যি-লু জাতি বলিত—ইহারা শীতকালে চর্ব্বি দিয়া গাত্র মণ্ডিত করিত এবং ইহাদের বাসগৃহ

কবরস্তূপেরই সহিত তুলনীয় বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ২য় হইতে ৫ম শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহাদের আধিপত্যকাল।

১৭ শতাব্দীতে চীনের সভ্যতার প্রভাব জুচেদের উপর খুবই অনুভূত হয়। এমন কি তাহাদের মধ্যে যে সম্প্রদায় এই প্রভাব তদীয় জীবনে সমধিক মাত্রায় গ্রহণ করে, তাহারাই সভ্য জুচেন জাতি রূপে মাঞ্চুরিয়ায় স্থান পায়; অবশিষ্টাংশ বুনো জুচেন বলিয়া সাহালিয়ান অর্থাৎ আমুর নদীর পারে বিতাড়িত হইয়া ক্রমশঃ সরিয়া যায়।

টুঙ্গাস-বংশীয় সন্নিহিত প্রতিবেশী সিটান বা ক্ষিটানেরা ১০ম শতাব্দীর মধ্যভাগে শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠে এবং লিয়াও-টাং, চীনের উত্তরাংশ—চিলি ও শেন্-সি প্রদেশদ্বয় পর্য্যন্ত অধিকৃত করিয়া লয়। চীনে তখন সুঙ্গ-বংশের রাজ্যকাল। এই সুঙ্গ-বংশ জুচেনদের সাহায্যপ্রার্থী হওয়ায়, তাহাদের শক্তিমান্ নেতা আকুত ক্ষিটানদিগকে পরাভূত করে। ১১১৫ খৃষ্টাব্দে এই বিজয়ী সেনাপতিই কিন অর্থাৎ সোণালী তাতারদের সম্রাট্ উপাধি গ্রহণ করেন এবং মিত্র চীনরাজের সহিত মতভেদ ঘটিলে, তাঁহাদেরও রাজ্যে যুদ্ধ-বাহিনী পরিচালিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত চিলি ও শেন্-সি প্রদেশ দখল করেন—এমন কি, দীর্ঘকালের জন্য তিনি হোনান প্রদেশও অধিকার করিয়া রাখেন। এই জুচেনদের সামরিক সংহতি বেশ সুদৃঢ় ও উৎকৃষ্ট ছিল। কিন্তু ১০ম শতাব্দীতেও, যখন প্রতিবেশী ক্ষিটানগণ বর্ণলিপি আবিষ্কার করিয়া ভাষার উন্নতি সাধন করিয়াছিল, তখনও জুচেন নেতৃবৃন্দ একটী শরের গাত্রে চিহ্ন কাটিয়া আদেশ প্রচার করিতেন ও

বেশী গুরুতর বিষয় হইলে, তিনটী চিহ্ন উক্ত শব্দে লাগাইয়া দিতেন। যাহা হউক, কিন-বংশের আধিপত্যলাভের সঙ্গে দ্রুততর উন্নতি স্রোতঃ প্রবাহিত হইতে সুরু করে। তখন বর্ণলিপি উদ্ভাবিত হয়—এমন কি ইহাদের সংক্ষিপ্ত রাজত্ব-কালে একটী ঐতিহাসিক মণ্ডলীগঠনেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সময়ে পঙ্গপালের ন্যায় এক নূতন শত্রুর অভ্যুদয় ঘটিয়া পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় জগৎকেই সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। ইহারাই মোঙ্গল বা মোগল। স্বনামধন্য চেঙ্গিস খাঁর অধীনে ইহারা দেখিতে দেখিতে চীন ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ অধিকার করিয়া ফেলিল। সুচেনদের আধিপত্য একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। যাহারা রহিল তাহারা বর্ত্তমান মাঞ্চুরিয়ার উত্তরাংশে হটিয়া গেল ও ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ববৎ বন্যাবস্থায় ডুবিয়া গেল।

১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে চৈনিক গ্রন্থকার ওয়াংকে তাহার বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যে তাঁহার সময়ে অসভ্য সুচি জাতি শীকার করিত, অশ্বপালন করিত ও যাযাবর মোঙ্গলদের ন্যায় ভ্রাম্যমান তাঁবুকেই গৃহবাস রূপে ব্যবহার করিত। তাহাদের অনেকে মুখ বিবর্ণ করিত, কেশগুচ্ছ বদ্ধ রাখিত—আধুনিক আমুরতীরবাসী সোণালী তাতারদের সহিত এই বর্ণনার কিছুমাত্র ভিন্নতা দৃষ্ট হয় না। এই বন্যাবস্থাপ্রাপ্ত সুচেনদিগকে দমনে ও শাসনে রাখিতে অবশ্য শাসকজাতিকে প্রবল সামরিক ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

এমনই অবস্থায় ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে তাহাদের মধ্যে এক অসাধারণ প্রতিভাবান্ নেতার আবির্ভাব হইল। তাঁহার নাম নুরহাচু—

পরে তাইৎসু বলিয়া তিনি সুবিখ্যাত হন। মাঞ্চুরিয়ার বর্ত্তমান ফেংটিয়েন প্রদেশে অপ্রসিদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, অকুতোভয় সাহস, রণচাতুর্য্য ও অধ্যবসায়ের গুণে ইনি আমুর নদীতীরবর্ত্তী বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়গুলিকে সংহতিবদ্ধ করিয়া তুলেন। ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে চীনের মীং বংশে বিরোধের ঝটিকা উঠিলে, সেই সুযোগে রাজশক্তির বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া তিনি সাফল্য লাভ করিলেন। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহার যোগ্য পুত্র পিতার বিজয়-যাত্রা অনুসরণ করিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহারই সন্তান শীং বা মাঞ্চু রাজবংশীয় প্রথম সম্রাট্। বলা বাহুল্য, মাঞ্চু নাম তাঁহাদের স্বগোষ্ঠী মাঞ্চু-সম্প্রদায় হইতে পরিগৃহীত। এই মাঞ্চুগণের ধমনীতে যে দুইটী রক্তধারা বহমান, তাহা টুঙ্গাস ও বুরিয়েট। ইহারা ধর্ম্মে বৌদ্ধ। বুরিয়েটদের ধর্ম্মগুরু উর্গার লামা শুধু মাঞ্চুরিয়া ও মোঙ্গলিয়ার সকল বুরিয়েটজাতির নয়, পরন্তু তিব্বতের দালাই লামার পরেই শ্রদ্ধার আসন পাইয়া থাকেন।

১৩শ হইতে ১৭শ শতাব্দী পর্য্যন্ত মীং-বংশের রাজ্যকালে মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণাংশ ফেংটিয়েন প্রদেশ চীনের শাসনাধীন ছিল ও সেই সময় হইতে চীনের ঘন লোকসমুদ্র উপছাইয়া দলে দলে লোকতরঙ্গ—চৈনিক কৃষাণ গিয়া মাঞ্চুরিয়ার সমতল ক্ষেত্রে উপনিবেশ সংস্থাপন করে। ১৯শ শতাব্দীর শেষ ভাগে মাঞ্চুরিয়ার লোকসংখ্যা হয় ১৪,০০০,০০০—এই প্রায় দেড় কোটীর তিন চতুর্থাংশই চৈনিক। শীং-বংশের রাজ্যলাভের সময় হইতে চীনের দুর্দ্দান্ত বন্দীদের এখানে নির্ব্বাসিত করায়, মাঞ্চুরিয়ায় ইহাদের

বংশবৃদ্ধির সহিত ইহাদের দস্যুবৃত্তি সকলের আশঙ্কাস্থল ও অনেক সময়ে আন্তর্জাতিক বিরোধের হেতু স্বরূপ হইয়াছে।

তারপর, জাপানের পালা। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতেই মাঞ্চুরিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতিবিধানের সহিত চীনের আভ্যন্তরিক অশান্তি উৎপাতের তুলনায় জাপানের প্রভাব যে নিরাপত্তি ও শান্তি সঞ্চার করিয়াছে, তাহাতে এই ঔপনিবেশিক বিস্তার আরও স্থায়ী ও দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। পূর্ব্বে চীন বাৎসরিক যে ৩।৪ লক্ষ লোক মাঞ্চুরিয়ায় পাঠাইত, তাহার অর্দ্ধেক বা তিন চতুর্থাংশ লোক আবার কৃষির সময় শেষ হইলে স্বদেশে ফিরিয়া যাইত। কিন্তু ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে জাপানের আওতায় যে ঔপনিবেশিক-গণ স্থায়ী ভাবে মাঞ্চুরিয়ায় বসবাস করিতে আরম্ভ করে, তাহাদের সংখ্যা এক বৎসরেই ১০ লক্ষ ও ক্রমে প্রতি সপ্তাহেই ৪০,০০০ করিয়া বাড়িতে আরম্ভ করে। আর রেলপথের ধারে, মাঞ্চুরিয়ার গভীর অভ্যন্তরে, বিশেষ ভাবে মধ্য ও দক্ষিণভাগে শতকরা ৯০ জন অর্থাৎ সংখ্যায় ২৪,৫০০,০০০ জন অধিবাসীই চৈনিক কৃষাণ। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চুরিয়ায় জাপানীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে লক্ষাধিক —ইহারা দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার বন্দরে বন্দরে ও দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলওয়ে অঞ্চলেই অধিকাংশ জমকাইয়া বসিয়াছে। তাহা ছাড়া, রুশিয়ান ঔপনিবেশিকও আছে। কিন্তু এই শেষোক্ত উভয় জাতীয়ের লোকেরা বাণিজ্য ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মসূত্রেই সে দেশে গিয়া বসতি করিয়াছে; চীনের ন্যায় কৃষকের সংখ্যা তাহাদের মধ্যে বেশী নহে। একদিক্ দিয়া দেখিলে, চীনের প্রবল রক্তধারাই অধিকাংশ অধিবাসীর মধ্যে প্রবাহিত হইয়া মাঞ্চুরিয়াকে যেমন

ছাইয়া ফেলিয়াছে, তেমনি তাহাদের বিপুল শ্রমশক্তির সহিত জাপানেরই ক্ষাত্রবল ও প্রতিভা যুক্ত হইয়া বর্ত্তমান মাঞ্চুরিয়াকে গড়িয়া তুলিয়াছে।

পীতাতঙ্কের তৃতীয় পর্য্যায়ে, অগ্নিবিস্ফোরণের মৌলিক ও জটিল কারণ এই মাঞ্চুরিয়াকে লইয়াই এইরূপ পুঞ্জে পুঞ্জে জমিয়া উঠিতেছে। শত সহস্র জাপসেনা যে দেশের মাটীতে রক্ত ঢালিয়াছে, জাপানের অস্থিকঙ্কাল, মেধামজ্জা, বুদ্ধি-প্রতিভা ও নেতৃত্বশক্তি দিয়া যে দেশের শান্তি, ঐশ্বর্য্য, সুখসমৃদ্ধি গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পাইয়াছে, জাপানের ভবিষ্যৎ-স্বপ্ন যে অনুকূল ক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যতন্ত্রের মধ্য দিয়াই বিরাট্ অতুল পীত-মহাজাতিকে একত্র একচ্ছত্রাধীন করিতে চায়, সে দেশের উপর প্রভাব ও অধিকার জাপানের বিধাতৃদত্ত প্রেরণারই সমতুল্য। ইংরাজ যেমন জগদ্ব্যাপী সূর্য্যাস্তহীন একচ্ছত্র সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিশ্বাসী, সে প্রেরণা যে তাহার বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট জীবন-প্রেরণা—destined mission—হৃদয় দিয়া সে তাহা বিশ্বাস করে ও সদম্ভে প্রচার করে, জাপানও তেমনি এক অতুলনীয় পীত সাম্রাজ্য গড়ার প্রেরণা অন্তরে অন্তরে প'ইয়াছে ও দিনের পর দিন সেই প্রেরণাটীকেই পুষ্ট ও পরিণত করিয়া চলিয়াছে। জাপানের সাধনা—এই মহাজাতি গঠন করা; সুদূর প্রাচ্যে এই পীত-সাম্রাজ্য সংহতিবদ্ধ ও একতন্ত্র করিয়া ৫০ কোটী লোক লইয়া সারা জগৎকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা। এক হিসাবে তাই বর্ত্তমানে জাপানই একমাত্র বিশ্বসাম্রাজ্যপ্রয়াসী বৃটন ও নব সভ্যতাস্পর্দ্ধী সোভায়েট রুশিয়ার যোগ্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। ভূতপূর্ব্ব

প্রধানমন্ত্রী ব্যারণ টানাকার গোপনপত্রে জাপানের এই গূঢ় আকাঙ্ক্ষারই সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের সন্ধিফলে, জাপান দক্ষিণ ও পূর্ব্বে অর্থাৎ আভ্যন্তরিক মাঞ্চুরিয়ায় যে শক্তি-প্রাধান্য দাবী করিয়াছিল, তাহাই পাইয়াছিল। পরে ১৯২১-২২ সালের নবশক্তিমিলিত সন্ধিপত্রে চীনে "প্রভাব-তন্ত্র" উঠাইয়া "মুক্তদ্বার" খুলিয়া দিবার প্রস্তাব গৃহীত হইলেও, ব্যারণ শিডেহারারই আপত্তিতে ওয়াশিংটন-সন্ধিসভার এই প্রস্তাবনা কার্য্যতঃ নাকচ হইয়া যায়। তাহারই অব্যবহিত পরে চীনে যে অন্তর্যুদ্ধ বাধে, তাহাতে জাপান মাঞ্চুরিয়ায় এই শক্তিকেন্দ্র অটুট রাখে ও চীনকে শাসাইয়া তথায় শান্তিরক্ষা করে। এখানে চীনের সহিত রুশিয়াব বস্তুতন্ত্রভাবে অধিক স্বার্থ-সংঘর্ষের তেমন হেতু নাই ; কিন্তু জাপানের উদ্যত মুষল—নবজাগ্রত চীন অন্তর্বিরোধে আজ দুর্ব্বল ও বিপন্ন হইলেও, সহজে মানিয়া লইতে পারে না। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এই পরস্পর জাতীয়তার সংঘর্ষেই জাগিয়াছে ও ক্রমে ক্রমে জ্বালামালায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। একটা বিরাট, প্রাচীন, সুসভ্য জাতি আজ অনৈক্য-পীড়িত ও অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন বলিয়া, সংহতিবদ্ধ সুসজ্জিত জাপান প্রভুত্বপরায়ণ দম্ভ ও অহঙ্কারের প্রণোদনায় দাবিয়া, শাসাইয়া, ভ্রূভঙ্গে ও শেলাঘাতে বজ্রাহত করিয়া, আত্মস্বাতন্ত্র্য লয় করাইয়া, তাহাকে জোর করিয়া নিজ সত্তায় মিশাইয়া লইবে—সে প্রেরণা যত বড় বৃহৎ স্বপ্নেরই দ্যোতক হউক—বিধাতার কল্পলোকে এত বড় দুঃসহ ঘটনা কল্পিত হইয়া আছে কি না, জানি না ; কিন্তু মানবের বিবেকবুদ্ধি, মানবের হৃদয় ইহাতে কিছুতেই সায় দেয় না। মানবতার

ভবিষ্যৎ যদি জাতীয়তাকে চূর্ণ করিয়া একত্বের প্রতিষ্ঠা চায়, সে একত্বকে অত্যাচার বলিয়াই সকল জাতির সত্তা চিরদিন অন্তরে অন্তরে অস্বীকার করিয়া চলিবে ; গায়ের জোরে অথবা বুদ্ধির জোরে সব সময়ে সে অস্বীকার কণ্ঠে আত্মপ্রকাশ করিতে না পারিলেও, অন্তরে অন্তরে যে মর্ম্মদাহের সঞ্চার হইতে থাকিবে, তাহা পুঞ্জীভূত দাবানলের ন্যায় একদিন পৃথিবীর বক্ষ চিরিয়া ভূকম্পন সৃষ্টি করিবেই। এই বিদারণ ও বিস্ফোরণকে হজম করিয়াই শক্তিমান্ হয়ত সঙ্কল্প সিদ্ধ করার স্পর্দ্ধা রাখে ; কিন্তু রোমসাম্রাজ্যের ন্যায় সেই বিরাট্ সাম্রাজ্যের উত্থানপতন একই কালির অক্ষরে লেখা—কার্য্যকরণসূত্রে একত্র গ্রথিত। একজন জাপানীরই লেখা একখণ্ড ক্ষুদ্র পুস্তিকা হঠাৎ চক্ষে পড়িয়াছিল— "The rise and fall of the British Empire"—বিজ্ঞ জাপ-লেখক ঝি'কে উপলক্ষ করিয়া বধূকে শিক্ষা দিবার ছলেই এই পুঁথিখানিতে জাপানী তরুণের জন্য তাহাদের ভবিষ্য সাম্রাজস্বপ্নের গুণাগুণ বিশ্লেষণ পূর্ব্বক সাবধান ও সতর্ক ভাবেই মানসিক ভূমিকা প্রস্তুত করিতে চাহিয়াছেন। নীট্সে ও জেনারল বার্ণহাডির ন্যায় লেখক যেমন দুর্দ্ধর্ষ জর্ম্মণ জাতিকে বিশ্বজয়ের ব্রতে দীক্ষিত করিতে কৃতোদ্যম হইয়াছিল, তেমনি যদি এই শ্রেণীর লেখক ও প্রচারক ব্যারণ টানাকার মত রাষ্ট্র-নেতার ছত্রতলে দাঁড়াইয়া জাপজাতিকে সাম্রাজ্যপ্রয়াসী সাধনায় এমনই করিয়া উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে, বৃটনের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী জাপানেই মিলিবে। সোভায়েট রুশিয়ারও স্বপ্নবিলাস হয়ত বিপ্লবী ফ্রান্সেরই ন্যায় বিরাট্ অগ্নিময় আশার কুণ্ড সৃষ্টি করিয়াও

পরিশেষে সে অগ্নি-বীর্য্য নিজ দেশের চতুষ্পার্শিক গণ্ডী মধ্যেই —ঘর সামলাইতেই ব্যয়িত ও নিঃশেষিত হইবে, ফুরাইয়া যাইবে; কিন্তু "এশিয়ার বৃটন" বিজিগীষু জাপান চীনকে দলিয়া পিষিয়া, শেষে যদি ভারতেরই পানে অসংখ্য বাহিনী ও সেনা, সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় পীত চমূ দূর ভবিষ্যতে কোনদিন প্রেরণ করিবার স্বপ্ন সত্য সত্যই দেখিয়া থাকে, সে স্বপ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে ভারতকেই—ইংরাজ ও ইংরাজশাসিত ভারতজাতির সম্মুখেই তাই পীতাতঙ্কের চতুর্থ পর্ব্ব স্বপ্নের ন্যায় ভাসিতেছে। আমরা কল্পলোকেরই সম্ভাবনীয়তার কথা বলিতেছি—সম্ভাবনার সব কিছুই যে সত্য ঘটনায় পরিণত হয় তাহা নহে; কিন্তু বুদ্ধিমান্ যে সে সময় থাকিতেই সাবধান হয়। ভারতের যে উদীয়মান্ জাতিশক্তি—তাহার সম্মুখের বাধা আজ যতই কেন না আশু ও আসন্ন সঙ্কট সৃষ্টি করুক, সে ঘোর সঙ্কটের চেয়ে ঘোরতর সঙ্কটের জন্যও যেন আমাদের জাগ্রত শক্তি চির প্রস্তুত থাকে, আপাত দৃষ্টি যেন অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতের দিকে চক্ষু মুদিয়া আমাদিগকে সমধিক সঙ্কটে পাতিত না করে—এই দূর-দৃষ্টিও আমাদের চাই। আজ প্রাচ্যের জাগরণ-যুগ সত্য সত্যই যদি আসিয়া থাকে, শ্বেত পীত, তাতার তুর্কী অথবা রুশিয়া জাপান যে জাতি-বর্ণ, যে দেশজাত সভ্যতাই তাহা হউক না কেন, ভারতের স্বাতন্ত্র্যপ্রতিষ্ঠার দিকেই সজাগ হইয়া আমাদিগকে সকল আশা ও লোভ ত্যাগ করিতে হইবে। সাহায্যের আশাও যে মোহ—ভারতের মুক্তি-যজ্ঞ যদি স্বীয় স্বতন্ত্র ও সিদ্ধ বৈশিষ্ট্য-রক্ষারই আয়োজন না হয়, যথার্থ ও খাঁটি আত্মনিষ্ঠ উদ্যোগ-

পর্ব্বের অভাবে আমাদের এ বিরাট্ সাধনাও মোহের দুর্ব্বিপাকে অগ্নিকটাহ হইতে লেলিহান অগ্নিকুণ্ডেই আমাদিগকে নিক্ষেপ করিতেও যে পারে না, এমন নহে।

সেদিন সাংঘাই'এর "Evening Post" লিখিয়াছে—"Imperialistic Japan not only has trampled Manchuria under foot, but has slapped Russia's face, thrown stones at great Britain and turned deaf ears to the United States' entreaties. Will the Japanese tiger fight the whole world alone or will it be induced to enter its cage ?"

এই প্রশ্ন—জাপানসংক্রান্ত শুধু বর্ত্তমানেরই প্রশ্ন নহে, ইহা জর্ম্মণ-সম্রাটের উত্থাপিত পীতাতঙ্ক সমস্যারই তৃতীয় ও চতুর্থ দফার প্রশ্ন-সূচনা।

আমরা আত্মনিষ্ঠাবান্ নবীন জাতিকে সকল দিকে চক্ষু খুলিয়া জাতীয়তার দিগ্‌দর্শন করিতে বলি। ভারতের তরুণ যেন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও অনাচ্ছন্ন ভবিষ্যদ্দৃষ্টির অধিকারী হইয়াই জাতির ভাগ্যগঠনে অগ্রসর হয়, ইহাই প্রার্থনা।